অমৃতের মৃত্যু

গ্রামের নাম বাঘমারি। রেল-লাইনের ধারেই গ্রাম, কিন্তু গ্রাম হইতে স্টেশনে যাইতে হইলে মাইল্‌খানেক হাঁটিতে হয়। মাঝখানে ঘন জঙ্গল। গ্রামের লোক স্টেশন যাইবার সময় বড় একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যায় না, রেল-লাইনের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া লাইনের ধার দিয়া যায়।

স্টেশনের নাম সান্তালগোলা। বেশ বড় স্টেশন, স্টেশন ঘিরিয়া একটি গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটা ধান্য-প্রধান। এখান হইতে ধান-চাল রপ্তানি হয়। গোটা দুই চালের কলও আছে।

যুদ্ধের সময় একদল মার্কিন সৈন্য সান্তালগোলা ও বাঘমারির মধ্যস্থিত জঙ্গলের মধ্যে কিছুকাল ছিল; তাহারা খালি গায়ে প্যান্ট পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, চাষীদের সঙ্গে বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তামাক খাইত। তারপর যুদ্ধের শেষে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল, রাখিয়া গেল কিছু অবৈধ সন্তানসন্ততি এবং কিছু ক্ষুদ্রায়তন অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যোমকেশ ও আমি যে-কর্ম উপলক্ষে সান্তালগোলায় গিয়া কিছুকাল ছিলাম তাহার সহিত উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সম্পর্ক আছে, তাহার বিশদ উল্লেখ যথাসময়ে করিব। উপস্থিত যে কাহিনী লিখিতেছি তাহার ঘটনাকেন্দ্র ছিল বাঘমারি গ্রাম, এবং যাহাদের মুখে কাহিনীর গোড়ার দিকটা শুনিয়াছিলাম তাহারা এই গ্রামেরই ছেলে। বাক্‌বাহুল্য বর্জনের জন্য তাহাদের মুখের কথাগুলি সংহত আকারে লিখিতেছি।

বাঘমারি গ্রামে যে কয়টি কোঠাবাড়ি আছে তন্মধ্যে সদানন্দ সুরের বাড়িটা সবচেয়ে পুরাতন। গুটিতিনেক ঘর, সামনে শান-বাঁধানো চাতাল, পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান। বাড়ির ঠিক পিছন হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে।

সদানন্দ সুর বয়স্থ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী স্ত্রী-পুত্র কেহ নাই, একলাই পৈতৃক ভিটায় থাকেন। তাঁহার একটি বিবাহিতা ভগিনী আছে বটে, স্বামী রেলের চাকরি করে, কিন্তু তাহারা শহুরে লোক, তাহাদের সহিত সদানন্দবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই। গ্রামের লোকের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক খুব গাঢ় নয়, কাহারও সহিত অসদ্ভাব না থাকিলেও বেশি মাখামাখিও নাই। বেশির ভাগ দিন সকালবেলা উঠিয়া তিনি স্টেশনের গঞ্জে চলিয়া যান, সন্ধ্যার সময় গ্রামে ফিরিয়া আসেন। তিনি কী কাজ করেন সে সম্বন্ধে কাহারও মনে খুব স্পষ্ট ধারণা নাই। কেহ বলে ধান-চালের দালালি করেন; কেহ বলে বন্ধকী কারবার আছে। মোটের উপর লোকটি অত্যন্ত সংবৃতমন্ত্র ও মিতব্যয়ী, ইহার অধিক তাঁহার বিষয়ে বড় কেহ কিছু জানে না।

একদিন চৈত্র মাসের ভোরবেলা সদানন্দ বাড়ি হইতে বাহির হইলেন ; একটি মাঝারি আয়তনের ট্রাঙ্ক ও একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ বাহিরে রাখিয়া দরজায় তালা লাগাইলেন। তারপর ব্যাগ ও ট্রাঙ্ক দুই হাতে ঝুলাইয়া যাত্রা করিলেন।

বাড়ির সামনে মাঠের মতো খানিকটা খোলা জায়গা। সদানন্দ মাঠ পার হইয়া রেল-লাইনের দিকে চলিয়াছেন, গ্রামের বৃদ্ধ হীরু মোড়লের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হীরু বলিল, 'কী গো কত্তা, সকালবেলা বাক্স-প্যাটরা লিয়ে কোথায় চলেছেন ?'

সদানন্দ থামিলেন, 'দিন কয়েকের জন্য বাইরে যাচ্ছি।'

হীরু বলিল, 'অ। তিত্থিধম্ম করতে চললেন নাকি ?'

সদানন্দ শুধু হাসিলেন। হীরু বলিল, 'ইরির মধ্যে তিত্থিধম্ম ? বয়স কত হল কত্তা ?'

'পঁয়তাল্লিশ।' সদানন্দ আবার চলিলেন।

হীরু পিছন হইতে ডাক দিয়া প্রশ্ন করিল, 'ফিরছেন কদ্দিনে ?'

'দিন ছ'সাতের মধ্যেই ফিরব।'

সদানন্দ চলিয়া গেলেন।

তাঁহার আকস্মিক তীর্থযাত্রা লইয়া গ্রামে একটু আলোচনা হইল। তাঁহার প্রাণে যে ধর্মকর্মের প্রতি আসক্তি আছে এ সন্দেহ কাহারও ছিল না। গত দশ বৎসরের মধ্যে এক রাত্রির জন্যও তিনি বাহিরে থাকেন নাই। সকলে আন্দাজ করিল নীরব-কর্মা সদানন্দ সুর কোনও মতলবে বাহিরে গিয়াছেন।

ইহার দিন তিন-চার পরে সদানন্দের বাড়ির সামনের মাঠে গ্রামের ছেলে-ছোকরারা বসিয়া জটলা করিতেছিল। গ্রামে পঁচিশ-ত্রিশ ঘর ভদ্রশ্রেণীর লোক বাস করে ; সন্ধ্যার পর তরুণ-বয়স্কেরা এই মাঠে আসিয়া বসে, গল্প গুজব করে, কেহ গান গায়, কেহ বিড়ি-সিগারেট টানে। শীত এবং বর্ষাকাল ছাড়া এই স্থানটাই তাহাদের আড্ডাঘর।

আজ অমৃত নামধারী জনৈক যুবককে সকলে মিলিয়া ক্ষেপাইতেছিল। অমৃত গাঁয়ের একটি ভদ্রলোকের অনাথ ভাগিনেয়, একটু আধ-পাগলা গোছের ছেলে। রোগা তালপাতার সেপাইয়ের মত চেহারা, তড়বড় করিয়া কথা বলে, নিজের সাহস ও বুদ্ধিমত্তা প্রমাণের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। তাই সুযোগ পাইলে সকলেই তাহাকে লইয়া একটু রঙ্গ-তামাশা করে।

সকালের দিকে একটা ব্যাপার ঘটিয়াছিল।—নাদু নামক এক যুবকের সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে ; তাহার বৌয়ের নাম পাপিয়া। বৌটি সকালবেলা কলসী লইয়া পুকুরে জল আনিতে যাইতেছিল, ঘাটে অন্য মেয়েরাও ছিল। অমৃত পুকুরপাড়ে বসিয়া খোলামকুচি দিয়া জলের উপর ব্যাঙ-লাফানো খেলিতেছিল ; নাদুর বৌকে দেখিয়া তাহার কি মনে হইল, সে পাপিয়ার স্বর অনুসরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিল—'পিউ পিউ—পিয়া পিয়া পাপিয়া—'

মেয়েরা হাসিয়া উঠিল। বৌটি অপমান বোধ করিয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল এবং স্বামীকে জানাইল। নাদু অগ্নিশর্মা হইয়া লাঠি হাতে ছুটিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া অমৃত পুকুরপাড়ের একটা নারিকেল গাছে উঠিয়া পড়িল। তারপর গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা আসিয়া শান্তিরক্ষা করিলেন। অমৃতের মনে যে কু-অভিপ্রায় ছিল না তাহা সকলেই জানিত, গোঁয়ার-গোবিন্দ নাদুও বুঝিল। ব্যাপার বেশিদূর গড়াইতে পাইল না।

কিন্তু অমৃত তাহার সমবয়স্কদের শ্লেষ-বিদ্রূপ হইতে নিস্তার পাইল না। সন্ধ্যার সময় সে মাঠের আড্ডায় উপস্থিত হইলেই সকলে তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল।

পটল বলিল, 'হ্যাঁরে অমর্ত, তুই এতবড় বীর, নাদুর সঙ্গে লড়ে যেতে পারলি না ? নারকেল

গাছে উঠলি !'

অমৃত বলিল, 'হুঁঃ, আমি তো ডাব পাড়তে উঠেছিলাম। নেদোকে আমি ডরাই না, ওর হাতে যদি লাঠি না থাকত অ্যায়সা লেঙ্গি মারতাম যে বাছাধনকে বিছানায় পড়ে কোঁ-কোঁ করতে হত !'

গোপাল বলিল, 'শাবাশ ! বাড়ি গিয়ে মামার কাছে খুব ঠেঙানি খেয়েছিলি তো ?'

অমৃত হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, 'মামা মারেনি, মামা আমাকে ভালবাসে। শুধু মামী কান মলে দিয়ে বলেছিল—তুই একটা গো-ভূত।'

সকলে হি-হি করিয়া হাসিল। পটল বলিল 'ছি ছি, তুই এমন কাপুরুষ ! মেয়েমানুষের হাতের কানমলা খেলি ?'

অমৃত বলিল, 'মামী গুরুজন, তাই বেঁচে গেল, নইলে দেখে নিতাম। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

দাশু বলিল, 'আচ্ছা অমৃরা, তুই তো মানুষকে ভয় করিস না। সত্যি বল দেখি, ভূত দেখলে কি করিস ?'

একজন নিম্নস্বরে বলিল, 'কাপড়ে-চোপড়ে—'

অমৃত চোখ পাকাইয়া বলিল, 'ভূত আমি দেখেছি কিন্তু মোটেই ভয় পাইনি।'

সকলে কলরব করিয়া উঠিল, 'ভূত দেখেছিস ? কবে দেখলি ? কোথায় দেখলি ?'

অমৃত সগর্বে জঙ্গলের দিকে শীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া বলিল, 'ঐখানে।'

'কবে দেখেছিস ? কী দেখেছিস ?'

অমৃত গম্ভীর স্বরে বলিল, 'ঘোড়া-ভূত দেখেছি।'

দু'একজন হাসিল। গোপাল বলিল, 'তুই গো-ভূত কিনা, তাই ঘোড়া-ভূত দেখেছিস। কবে দেখলি ?'

'পরশু রাত্তিরে।' অমৃত পরশু রাত্রের ঘটনা বলিল, 'আমাদের কৈলে বাছুরটা দড়ি খুলে গোয়ালঘর থেকে পালিয়েছিল। মামা বললে, যা অমৃরা, জঙ্গলের ধারে দেখে আয়। রাত্তির তখন দশটা ; কিন্তু আমার তো ভয়-ডর নেই, গেলাম জঙ্গলে। এদিক ওদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথায় বাছুর ! চাঁদের আলোয় জঙ্গলের ভেতরটা হিলি-বিলি দেখাচ্ছে—হঠাৎ দেখি একটা ঘোড়া। খুরের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বুঝি বাছুরটা ; ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একটা ঘোড়া বনের ভেতর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়া, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আমি রামনাম করতে করতে ফিরে এলাম। রামনাম জপ্‌লে ভূত আর কিছু বলতে পারে না।'

দাশু জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে গেল ঘোড়া-ভূত ?'

'গাঁয়ের দিক থেকে ইস্টিশানের দিকে।'

'ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিল ?'

'অত দেখিনি।'

সকলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভূতের গল্প বানাইয়া বলিতে পারে এত কল্পনাশক্তি অমৃতের নাই। নিশ্চয় সে জ্যান্ত ঘোড়া দেখিয়াছিল। কিন্তু জঙ্গলে ঘোড়া আসিল কোথা হইতে ? গ্রামে কাহারও ঘোড়া নাই। যুদ্ধের সময় যে মার্কিন সৈন্য জঙ্গলে ছিল তাহাদের সঙ্গেও ঘোড়া ছিল না। ইস্টিশানের গঞ্জে দুই-চারিটা ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া আছে বটে। কিন্তু ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া রাত্রিবেলা জঙ্গলে ছুটাছুটি করিবে কেন ? তবে কি অমৃত পলাতক বাছুরটাকেই ঘোড়া বলিয়া ভুল করিয়াছিল ?

অবশেষে পটল বলিল, 'বুঝেছি, তুই বাছুর দেখে ঘোড়া-ভূত ভেবেছিলি।'

অমৃত সজোরে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, 'না না, ঘোড়া। জলজ্যান্ত ঘোড়া-ভূত আমি দেখেছি।'

'তুই বলতে চাস্ ঘোড়া-ভূত দেখেও তোর দাঁত-কপাটি লাগেনি ?'

'দাঁত-কপাটি লাগবে কেন ? আমি রামনাম করেছিলাম।'

'রামনাম করেছিলি বেশ করেছিলি। কিন্তু ভয় পেয়েছিলি বলেই না রামনাম করেছিলি ?'

'মোটেই না, মোটেই না'—অমৃত আস্ফালন করিতে লাগিল, 'কে বলে আমি ভয় পেয়েছিলাম ! ভয় পাবার ছেলে আমি নয়।'

দাশু বলিল, 'দ্যাখ অমরা, বেশি বড়াই করিসনি। তুই এখন জঙ্গলে যেতে পারিস ?'

'কেন পারব না !' অমৃত ঈষৎ শঙ্কিতভাবে জঙ্গলের দিকে তাকাইল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটিয়াছে, জঙ্গলের গাছগুলা ঘনকৃষ্ণ ছায়া রচনা করিয়াছে ; অমৃত একটু থামিয়া গিয়া বলিল, 'ইচ্ছে করলেই যেতে পারি, কিন্তু যাব কেন ? এখন তো আর বাছুর হারায়নি।'

গোপাল বলিল, 'বাছুর না হয় হারায়নি। কিন্তু তুই গুল মারছিস কিনা বুঝব কি করে ?'

অমৃত লাফাইয়া উঠিল, 'গুল মারছি ! আমি গুল মারছি ! দ্যাখ্ গোপ্‌লা, তুই আমাকে চিনিস না—'

'বেশ তো, চিনিয়ে দে। যা দেখি একলা জঙ্গলের মধ্যে। তবে বুঝব তুই বাহাদুর।'

অমৃত আর পারিল না, সদর্পে বলিল, 'যাচ্ছি—এক্ষুনি যাচ্ছি। আমি কি ভয় করি নাকি ?' সে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল।

পটল তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'শোন্, এই খড়ি নে। বেশি দূর তোকে যেতে হবে না, সদানন্দদা'র বাড়ির পিছনে যে বড় শিমুলগাছটা আছে তার গায়ে খড়ি দিয়ে ঢ্যারা মেরে আসবি। তবে বুঝব তুই সত্যি গিয়েছিলি।'

খড়ি লইয়া ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে অমৃত বলিল, 'তোরা এখানে থাকবি তো ?'

'থাকব।'

অমৃত জঙ্গলের দিকে পা বাড়াইল। যতই অগ্রসর হইল ততই তাহার গতিবেগ হ্রাস হইতে লাগিল। তবু শেষ পর্যন্ত সে সদানন্দ সুরের বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাঠে উপবিষ্ট ছোকরার দল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া নীরবে জঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিল। একজন বিড়ি ধরাইল। একজন হাসিল, 'অমরা হয়তো সদানন্দদা'র বাড়ির পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে।'

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। সকলের দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে।

হঠাৎ জঙ্গল হইতে চড়াৎ করিয়া একটা শব্দ আসিল। শুক্‌নো গাছের ডাল ভাঙ্গিলে যেরূপ শব্দ হয় অনেকটা সেইরূপ। সকলে চকিত হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল।

আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু অমৃত ফিরিয়া আসিল না। অমৃত যেখানে গিয়াছে, ছোকরাদের দল হইতে সেই শিমুলগাছ বড়জোর পঞ্চাশ-ষাট গজ। তবে সে ফিরিতে এত দেরি করিতেছে কেন !

আরও তিন-চার মিনিট অপেক্ষা করিবার পর পটল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চল্ দেখি গিয়ে। এত দেরি করছে কেন অমরা !

সকলে দল বাঁধিয়া যে-পথে অমৃত গিয়াছিল সেই পথে চলিল। একজন রহস্য করিয়া বলিল, 'অমরা ঘোড়া-ভূতের পিঠে চড়ে পালাল নাকি ?'

অমরা কিন্তু পালায় নাই। সদানন্দ সুরের বাড়ির খিড়কি হইতে বিশ-পঁচিশ গজ দূরে

শিমুলগাছ। সেখানে জ্যোৎস্না-বিদ্ধ অন্ধকারে সাদা রঙের কি একটা পড়িয়া আছে। সকলে কাছে গিয়া দেখিল—অমৃত।

একজন দেশলাই জ্বালিল। অমৃত চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার বুকের জামা রক্তে ভিজিয়া উঠিয়াছে।

অমৃত ভূতের ভয়ে মরে নাই, বন্দুকের গুলিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

দুই

ব্যোমকেশ আমাকে লইয়া সান্তালগোলায় আসিয়াছিল একটা সরকারী তদন্ত উপলক্ষে। সরকারের বেতনভুক পুলিস-কর্মচারীরা ব্যোমকেশকে স্নেহের চোখে দেখেন না বটে, কিন্তু মন্ত্রিমহলে তাহার খাতির আছে। পুলিসের জবাব দেওয়া কেস্ মাঝে মাঝে তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে।

গত মহাযুদ্ধের সময় অনেক বিদেশী সৈন্য আসিয়া এদেশের নানা স্থানে ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়াছিল; তারপর যুদ্ধের শেষে বিদেশীরা চলিয়া গেল, দেশে স্বদেশী শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল। স্বাধীনতার রক্ত-স্নান শেষ করিয়া দেশ যখন মাথা তুলিল তখন দেখিল হ্রদের উপরিভাগ শান্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশে হিংসুক নক্রকুল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশী সৈন্যদলের ফেলিয়া-যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এই নক্রকুলের নখদন্ত। রেলের দুর্ঘটনা, আকস্মিক বোমা বিস্ফোরণ, সশস্ত্র ডাকাতি—নূতন শাসনতন্ত্রকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পুলিস তদন্তে দু'চারজন দুর্বৃত্ত ধরা পড়িলেও, বোমা পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র কোথা হইতে সরবরাহ হইতেছে তাহার হদিস মিলিল না। বিদেশী সিপাহীরা যেখানে ঘাঁটি গাড়িয়াছিল, অস্ত্রগুলি যে তাহার কাছেপিঠেই সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল অস্ত্র-সরবরাহকারী লোকগুলাকে ধরা। যাহারা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের কালাবাজার চালাইতেছে তাহাদের ধরিতে না পারিলে এ উৎপাতের মূলোচ্ছেদ হইবে না।

সরকারী দপ্তরের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্যোমকেশ প্রথমে সান্তালগোলায় আসিয়াছে। স্থানটি ছোট, কোন অবস্থাতেই তাহাকে শহর বলা চলে না। স্টেশনের কাছে রেল-কর্মচারীদের একসারি কোয়ার্টার। একটা পাকা রাস্তা স্টেশনকে স্পর্শ করিয়া দুই দিকে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে এবং কুড়ি পঁচিশ বিঘা জমিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; এই স্থানটুকুর মধ্যে কয়েকটা বড় বড় আড়ত, পুলিস থানা, পোস্ট-অফিস, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সরকারী বিশ্রান্তিগৃহ ইত্যাদি আছে। যে দু'টি চাল-কলের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি সে দু'টি এই রাস্তা-ঘেরা স্থানের দুই প্রান্তে অবস্থিত। স্থানীয় লোক অধিকাংশ বাঙালী হইলেও, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী যথেষ্ট আছে।

আমরা সরকারী বিশ্রান্তিগৃহে আড্ডা গাড়িয়াছিলাম। ব্যোমকেশের এখানে আত্মপরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না, এ ধরনের তদন্তে যতটা প্রচ্ছন্ন থাকা যায় ততই সুবিধা; কিন্তু আসিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশের পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য কাহারও অবিদিত নাই। স্থানীয় পুলিসের দারোগা সুখময় সামন্ত পুলিস বিভাগ হইতে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাঁহার কৃপায় ব্যোমকেশের খ্যাতি দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

দারোগা সুখময়বাবুর মুখ ভারি মিষ্ট, কিন্তু মস্তিষ্কটি দুষ্টবুদ্ধিতে ভরা। তিনি প্রকাশ্যে ব্যোমকেশকে সাহায্য করিতেছিলেন এবং অপ্রকাশ্যে যত ভাবে সম্ভব বাগড়া দিতেছিলেন।

পুলিস যেখানে ব্যর্থ হইয়াছে, একজন বাহিরের লোক আসিয়া সেখানে কৃতকার্য হইবে, ইহা বোধ হয় তাঁহার মনঃপুত হয় নাই।

যাহোক, বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ব্যোমকেশ কাজ আরম্ভ করিল। পরিচয় গোপন রাখা সম্ভব নয় দেখিয়া প্রকাশ্যভাবেই অনুসন্ধান শুরু করিল। খোলাখুলি থানায় গিয়া দারোগা সুখময়বাবুর নিকট হইতে স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামের তালিকা সংগ্রহ করিল। স্টেশনে গিয়া মাস্টার, মালবাবু, টিকিট-বাবু, চেকার প্রভৃতির সহিত ভাব জমাইল; কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গিয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে স্থানীয় বিত্তবান ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইল। সকলেই জানিতে পারিয়াছিল ব্যোমকেশ কি জন্য আসিয়াছে, তাই সকলে সহযোগিতা করিলেও বিশেষ কোনও ফল হইল না।

চার-পাঁচ দিন বৃথা ঘোরাঘুরির পর ব্যোমকেশ এক মতলব বাহির করিল। স্থানীয় যে-কয়জন বর্ধিষ্ণু লোককে সন্দেহ করা যাইতে পারে তাহাদের বেনামী চিঠি লিখিল। চিঠির মর্ম: আমি তোমার গোপন কার্যকলাপ জানিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই দেখা হইবে।—চিঠিগুলি আমি দুই-তিন স্টেশন দূরে জংশনে গিয়া ডাকে দিয়া আসিলাম।

চার ফেলিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু মাছের দেখা নাই। এইভাবে আরও দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। নিষ্কর্মার মতো দিন রাত্রে ঘুমাইয়া ও সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণ করিয়া স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু কাজের সুরাহা হইল না।

তারপর একদিন সকালবেলা বাঘমারি গ্রাম হইতে তিনটি ছেলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় গরম জিলাপী সহযোগে গরম দুগ্ধ সেবন করিয়া অভ্যন্তরভাগে বেশ একটি তৃপ্তিকর পরিপূর্ণতা অনুভব করিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে কয়েকটি মুণ্ড উঁকিঝুঁকি মারিতেছে দেখিয়া ব্যোমকেশ বাহিরে আসিল, 'কি চাই?'

বিশ্রান্তিগৃহে পাশাপাশি দু'টি ঘর, সামনে ঢাকা বারান্দা। তিনটি যুবক বারান্দায় উঠিয়া ইতস্তত করিতেছিল, ব্যোমকেশকে দেখিয়া যুগপৎ দন্তবিকাশ করিল। একজন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।'

যুবকদের দন্তবিকাশ কর্ণচুম্বী হইয়া উঠিল। একজন বলিল, 'আমরা বাঘমারি গ্রাম থেকে আসছি।'

'বাঘমারি গ্রাম! সে কোথায়?'

'আজ্ঞে, বেশি দূর নয়, এখান থেকে মাইলখানেক।'

'আসুন'—বলিয়া ব্যোমকেশ তাহাদের ঘরে লইয়া আসিল। বিশ্রান্তিগৃহের বাঁধা বরাদ্দ আসবাব—একটি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি আরাম-কেদারা, দু'টি খাট, মেঝেয় নারিকেল-ছোবড়ার চাটাই পাতা। যুবকেরা দু'জন মেঝেয় বসিল, একজন টেবিলে উঠিয়া বসিল। ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া বলিল, 'কী ব্যাপার বলুন দেখি?'

যে ছোকরা অগ্রণী হইয়া কথা বলিতেছিল তাহার নাম পটল। অন্য দু'জনের নাম দাশু ও গোপাল। পটল বলিল, 'আপনি শোনেননি! আমাদের গ্রামে একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে।'

'বলেন কি! কবে?' ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় উঠিয়া বসিল।

দাশু ও গোপাল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'পরশু সন্ধ্যের পর।'

পটল বলিল, 'পুলিসে তক্ষুনি খবর দেওয়া হয়েছিল। কাল সকালবেলা ন'টার সময় দারোগা সুখময় সামন্ত গিয়েছিল। লাশ নিয়ে চলে এসেছিল, তারপর আর কোনও খবর

নেই। আজ আমরা আপনার কাছে আসবার আগে থানায় গিয়েছিলাম, সুখময় দারোগা আমাদের হাঁকিয়ে দিলে। লাশ নাকি সদরে পাঠানো হয়েছে, হাসপাতালে চেরা-ফাঁড়া হবে। আপনি এসব কিছুই জানেন না ? তবে যে শুনেছিলাম আপনি পুলিসকে সাহায্য করবার জন্য এখানে এসেছেন !'

ব্যোমকেশ শুষ্কস্বরে বলিল, 'দারোগাবাবু বোধ হয় এ খবর আমাকে দেওয়া দরকার মনে করেননি। সে যাক। কে কাকে খুন করেছে ? কী দিয়ে খুন করেছে ?'

পটল বলিল, 'বন্দুক দিয়ে। খুন হয়েছে আমাদের এক বন্ধু—অমৃত। কে খুন করেছে তা কেউ জানে না। ব্যোমকেশবাবু, অমরার মৃত্যুর জন্য আমরাও খানিকটা দায়ী, ঠাট্টা-তামাশা করতে গিয়ে এই সর্বনাশ হয়েছে। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। সুখময় দারোগার দ্বারা কিছু হবে না, আপনি দয়া করে খুঁজে বার করুন কে খুন করেছে। আমরা আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বন্দুক দিয়ে খুন হয়েছে। আশ্চর্য !—সব কথা খুলে বলুন।'

অতঃপর পটল, দাশু ও গোপাল মিলিয়া কখনও একসঙ্গে কখনও পর্যায়ক্রমে যে কাহিনী বলিল তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে। অমৃতের মৃত্যুতে তাহারা খুব কাতর হইয়াছে এমন মনে হইল না, কিন্তু অমৃতের রহস্যময় মৃত্যু তাহাদের উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। এবং ব্যোমকেশকে হাতের কাছে পাইয়া এই উত্তেজনা নাটকীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।

অমৃতের মৃত্যু-বিবরণ শেষ হইতে আন্দাজ দু'ঘণ্টা লাগিল ; ব্যোমকেশ মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়া অস্পষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়া লইল। শেষে বলিল, 'ঘটনা রহস্যময় বটে, তার ওপর বন্দুক।—কিন্তু শুধু গল্প শুনলে কাজ হবে না, জায়গাটা দেখতে হবে।'

তিনজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পটল বলিল, 'বেশ তো, এখুনি চলুন না, ব্যোমকেশবাবু। আপনি আমাদের গ্রামে যাবেন সে তো ভাগ্যের কথা।'

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'এ-বেলা থাক। দু'দিন যখন কেটে গেছে তখন একবেলায় বিশেষ ক্ষতি হবে না। আমরা ও-বেলা পাঁচটা নাগাদ যাব।'

'বেশ, আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

তাহারা চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দারোগা সুখময়বাবু আসিলেন। চেয়ারে নিজের সুবিপুল বপুখানি ঠাসিয়া দিয়া বলিলেন, 'বাঘমারির ছোঁড়াগুলো এসেছিল তো ? আমার কাছেও গিয়েছিল। বাঙালীর ছেলে, একটা হুজুগ পেয়েছে, আর কি রক্ষে আছে ! আপনি ওদের আমল দেবেন না মশাই, আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আমল দেব কেন ? আপনি তো ওদের আগে থাকতেই চেনেন, কেমন ছেলে ওরা ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'পাড়াগাঁয়ের বকাটে নিষ্কর্মা ছেলে আর কি। বাপের দু'বিঘে ধান-জমি আছে, কি তিনটে নারকেল গাছ আছে, ব্যস্, ঘরে বসে-বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ছেলেটা মারা গেছে সেও তো ওদেরই দলেরই ছেলে।'

'হ্যাঁ, সে ছিল আবার এককাটি বাড়া। মামার ভাতে ছিল, বকামি করে বেড়াতো।'

'বন্দুকের গুলিতে মরেছে শুনলাম।'

'তাই মনে হয়, তবে তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।'

'হুঁ। কে মেরেছে কিছু সন্দেহ করেন ?'

'কি করে সন্দেহ করব বলুন দেখি ? কেউ কিছু দেখেনি, সবাই একজোট হয়ে মাঠে আড্ডা দিচ্ছিল। তবে একটা ব্যাপারের জন্যে একজনের ওপর সন্দেহ হচ্ছে। সেদিন সকালবেলা অমৃত নাদুর বৌকে অপমান করেছিল। নাদু একরোখা গোঁয়ার মানুষ, লাঠি নিয়ে অমৃতকে মারতে ছুটেছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের আড্ডাতেও সে ছিল না। তাকে একবার থানায় আনিয়ে ভালো করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে।—কিন্তু এসব বাজে কথা এখন থাক। একটা জরুরী খবর আপনাকে দিতে এলাম।' সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, 'যমুনাদাস গঙ্গারামের নাম জানেন তো, এখানকার মস্তবড় আড়তদার। সে একটা বেনামী চিঠি পেয়েছে।'

ব্যোমকেশ গাঢ় ঔৎসুক্য দেখাইয়া বলিল, 'বেনামী চিঠি ! কি আছে তাতে ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'যমুনাদাস চুপিচুপি আমাকে চিঠি দেখিয়ে গেছে। খামের চিঠি, তাতে স্রেফ লেখা আছে : আমি সব জানতে পেরেছি, শীগ্‌গিরই দেখা হবে।'

'তাই নাকি ! তাহলে তো যমুনাদাসের ওপর নজর রাখতে হয়।'

'সে-কথা আর বলতে ! আমি একজন লোক লাগিয়ে দিয়েছি যমুনাদাসের পেছনে। সে অষ্টপ্রহর যমুনাদাসের ওপর নজর রেখেছে।'

'ভালো, ভালো ! আপনি পাকা লোক, ঠিক কাজই করেছেন। এবার হয়তো একটা সুরাহা হবে।'

সুখময়বাবুর মুখে একটু বিনীত আত্মপ্রসন্নতা খেলিয়া গেল, 'হে-হে—এই কাজ করে চুল পেকে গেল, ব্যোমকেশবাবু। তা সে যাক। এখন আপনার কি খবর বলুন। কিছু পেলেন ?'

ব্যোমকেশ হতাশ স্বরে বলিল, 'কৈ আর পেলাম ! যতদূর চাই, নাই নাই সে-পথিক নাই।'

সুখময়বাবু উদ্ধৃতিটা ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু যেন বুঝিয়াছেন এমনিভাবে হে-হে করিলেন। তিনি চেয়ারে একেবারে জাম হইয়া বসিয়াছিলেন, এখন টানা-হেঁচড়া করিয়া নিজেকে চেয়ারের বাহুমুক্ত করিলেন। বলিলেন, 'আজ উঠি, থানায় অনেক কাজ পড়ে আছে।'

ব্যোমকেশও উঠিয়া দাঁড়াইল, 'ভালো কথা, অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন নাকি ?'

সুখময়বাবু একটু ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনও পাইনি। কাল পরশু পাব বোধ হয়। কেন বলুন দেখি ?'

'পেলে এবার আমাকে দেখাবেন।'

সুখময়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখতে চান, দেখাব। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনি রুই-কাতলা ধরতে এসেছেন, আপনি যদি চুনোপুঁটির দিকে নজর দেন তাহলে আমরা বাঁচি কি করে ?'

'না না, নজর দিইনি। নিতান্তই অহেতুক কৌতূহল। কথায় বলে—নেই কাজ তো খই ভাজ।'

সুখময়বাবুর মুখে আবার হাসি ফুটিল, তিনি দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে প্রথম আমাকে লক্ষ্য করিলেন ; বলিলেন, 'এই-যে অজিতবাবু, কেমন আছেন ? গল্প-টল্প লেখা হচ্ছে ? আপনার আজগুবি গল্পগুলো পড়তে মন্দ লাগে না—হে-হে। তবে রবার্ট ব্লেকের মতো নয়। আচ্ছা, আসি।'

তিনি শ্রুতিবহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিয়া চোখ টিপিল ; বলিল, 'হে-হে।'

তিন

বৈকালবেলা ছেলেরা আসিয়া আমাদের গ্রামে লইয়া গেল। রেল-লাইনের ধার দিয়া যখন গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন গ্রামের সমস্ত পুরুষ অধিবাসী আমাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য লাইনের ধারে আসিয়া দাঁড়ায়াছে, ছেলে-বুড়া কেহ বাদ যায় নাই। সকলের চোখে বিস্ফারিত কৌতূহল। ব্যোমকেশ বক্সী কীদৃশ জীব তাহার স্বচক্ষে দেখিতে চায়।

মিছিল করিয়া আমরা গ্রামে প্রবেশ করিলাম। পটল অগ্রবর্তী হইয়া আমাদের একটি বাড়িতে লইয়া গেল। কাঁচা-পাকা বাড়ি, সামনের দিকে দু'টি পাকা-ঘর, পিছনে খড়ের চাল। মৃত অমৃতের মামার বাড়ি।

অমৃতের মামা বলরামবাবু বাড়ির সামনের চাতালে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন, জোড়হস্তে আমাদের সংবর্ধনা করিলেন। লোকটিকে ভালোমানুষ বলিয়া মনে হয়, কথাবলার ভঙ্গীতে সঙ্কুচিত জড়তা। তিনি ভাগিনার মৃত্যুতে খুব বেশি শোকাভিভূত না হইলেও একটু যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এসব আবার কেন ?'

বলরামবাবু অপ্রতিভভাবে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন, 'একটু চা—সামান্য—'

পটল বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের গ্রামের পায়ের ধুলো দিয়েছেন আমাদের ভাগ্যি। চা খেতেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, সে পরে হবে, আগে জঙ্গলটা দেখে আসি।'

'চলুন।'

পটল আবার আমাদের লইয়া চলিল। আরও কয়েকজন ছোকরা সঙ্গে চলিল। বলরামবাবুর বাড়ির সম্মুখ দিয়া যে কাঁচা-রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই গ্রামের প্রধান রাস্তা। এই রাস্তা একটি অসমতল শিলাকঙ্করপূর্ণ আগাছাভরা মাঠের কিনারায় আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের পরপারে একটিমাত্র পাকা বাড়ি ; সদানন্দ সুরের বাড়ি। তাহার পিছনে জঙ্গলের গাছপালা। আমরা মাঠে অবতরণ করিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই মাঠে বসে তোমরা সেদিন গল্প করছিলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ঠিক কোন্ জায়গায় বসেছিলে ?'

'এই যে—' আরও কিছুদূর গিয়া পটল দেখাইয়া বলিল, 'এইখানে।'

স্থানটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন, আগাছা নাই। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখান থেকে অমৃত যে-পথে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিয়ে চল।'

'আসুন।'

সদানন্দ সুরের দরজায় তালা ঝুলিতেছে, জানালাগুলি বন্ধ। আমরা বাড়ির পাশ দিয়া পিছন দিকে চলিলাম। পিছনে পাঁচিল-ঘেরা উঠান, পাঁচিল প্রায় এক মানুষ উঁচু, তাহার গায়ে একটি খিড়কি-দরজা। জঙ্গলের গাছপালা খিড়কি-দরজা পর্যন্ত ভিড় করিয়া আসিয়াছে।

বাড়ি অতিক্রম করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। জঙ্গলে পাতা-ঝরা আরম্ভ হইয়াছে, গাছগুলি পত্রবিরল, মাটিতে স্বয়ংবিশীর্ণ পীতপত্রের আস্তরণ। বাড়ির খিড়কি হইতে

পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড শিমুলগাছ, স্তম্ভের মতো স্থূল গুঁড়ি দশ-বারো হাত উঁচুতে উঠিয়া শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পটল আমাদের শিমুলতলায় লইয়া গিয়া একটা স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এইখানে অমৃত মরে পড়ে ছিল।'

স্থানটি ঝরা-পাতা ও শিমুল-ফুলে আকীর্ণ, অপঘাত মৃত্যুর কোনও চিহ্ন নাই। তবু ব্যোমকেশ স্থানটি ভালো করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কঠিন মাটির উপর কোনও দাগ নাই, কেবল শুক্‌না পাতার নিচে একখণ্ড খড়ি পাওয়া গেল। ব্যোমকেশ খড়িটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'এই খড়ি দিয়ে অমৃত গাছের গায়ে ঢেরা কাটতে এসেছিল। কিন্তু গাছের গায়ে খড়ির দাগ নেই। সুতরাং—'

পটল বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাগ কাটবার আগেই—'

এখানে দ্রষ্টব্য আর কিছু ছিল না। আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুরের খিড়কির দরজা বন্ধ আছে কিনা একবার দেখে যাই।'

খিড়কির দরজা ঠেলিয়া দেখা গেল ভিতর হইতে হুড়কা লাগানো। প্রাচীন দরজার তক্তায় ছিদ্র আছে, তাহাতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, উঠানের মাঝখানে একটি তুলসী-মঞ্চ, বাকী উঠান আগাছায় ভরা। একটা পেয়ারাগাছ এককোণে পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে, আর কিছু চোখে পড়িল না।

অতঃপর ব্যোমকেশ পাঁচিলের ধার দিয়া ফিরিয়া চলিল। তাহার দৃষ্টি মাটির দিকে। পাঁচিলের কোণ পর্যন্ত আসিয়া সে হঠাৎ আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'ও কি?'

অনাবৃত শুষ্ক মাটির উপর পরিষ্কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন; তাহার আশেপাশে আরও কয়েকটা অস্পষ্ট আঁকাবাঁকা চিহ্ন রহিয়াছে। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া চিহ্নটা পরীক্ষা করিল, আমরাও দেখিলাম। তারপর সে ঘাড় তুলিয়া দেখিল পাঁচিলে পরপারে পেয়ারাগাছের ডালপালা দেখা যাইতেছে।

বলিলাম, 'কি দেখছ? কিসের চিহ্ন ওগুলো?'

ব্যোমকেশ পটলের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি মনে হয়?'

পটলের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে; সে ওষ্ঠ লেহন করিয়া বলিল, 'ঘোড়ার খুরের দাগ মনে হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, ঘোড়া-ভূতের খুরের দাগ। অমৃত তাহলে মিছেকথা বলেনি।'

ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশের ভ্রূ সংশয়ভরে কুঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহার মনে ধোঁকা লাগিয়াছে, ঘোড়ার খুরের তাৎপর্য সে পরিষ্কার বুঝিতে পারে নাই। চলিতে চলিতে মাত্র দু'একটা কথা হইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সদানন্দ সুর কতদিন হল বাইরে গেছেন?'

পটল বলিল, 'সাত-আট দিন হল।'

'কবে ফিরবেন বলে যাননি?'

'না।'

'কোথায় গেছেন তাও কেউ জানে না?'

'না।'

বলরামবাবুর বাড়িতে পৌঁছিয়া চেয়ারে বসিলাম। দর্শকের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, তবু দু'চারজন অতি-উৎসাহী ব্যক্তি ব্যোমকেশকে দেখিবার আশায় আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বলরামবাবু আমাদের চা ও জলখাবার আনিয়া দিলেন। পটল দাশু গোপাল প্রভৃতি ছোকরা কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলরামবাবুকে সওয়াল আরম্ভ করিল—

'অমৃত আপনার আপন ভাগ্নে ছিল ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ওর মা-বাপ কেউ ছিল না ?'

'না। আমার বোন অমর্তকে কোলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল। আমার কাছে থাকত। তারপর সেও মারা গেল। অমর্তর বয়স তখন পাঁচ বছর।'

'আপনার নিজের ছেলেপুলে নেই ?

'একটি মেয়ে আছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'অমৃতের কত বয়স হয়েছিল ?'

'একুশ।'

'তার বিয়ে দেননি ?'

'না। বুদ্ধিসুদ্ধি তেমন ছিল না, ন্যালাক্ষ্যাপা ছিল, তাই বিয়ে দিইনি।'

'কাজকর্ম কিছু করত ?'

'মাঝে মাঝে করত, কিন্তু বেশিদিন চাকরি রাখতে পারত না। সান্তালগোলার বড় আড়তদার ভগবতীবাবুর গদিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম, কিছুদিন কাজ করেছিল। তারপর বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর চালের কলে মাসখানেক ছিল, তা বদ্রিদাসও রাখল না। কিছুদিন থেকে বিশু মল্লিকের চালের কলে ঘোরাঘুরি করছিল, কিন্তু কাজ পায়নি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল নীরবে নারিকেল-লাড়ু চিবাইল, তারপর এক ঢোক চা খাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'গ্রামে কারুর ঘোড়া আছে ?'

বলরামবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন,—ছোকরারাও মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। শেষে বলরামবাবু বলিলেন, 'গাঁয়ে তো কারুর ঘোড়া নেই।'

'কারুর বন্দুকের লাইসেন্স আছে ?'

'আজ্ঞে না।'

'নাদু নামে এক ছোকরার কথা শুনেছি, তার ভালো নাম জানি না। তাকে পেলে দু'একটা প্রশ্ন করতাম।'

বলরামবাবু ছোকরাদের পানে তাকাইলেন, তাহারা আর একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল ; তারপর পটল বলিল, 'নাদু কাল বৌকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'শ্বশুরবাড়ি কোথায় ?'

'কৈলেসপুরে। ট্রেনে যেতে হয়, সান্তালগোলা থেকে তিন-চার স্টেশন দূরে।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে চায়ের পেয়ালা শেষ করিল। নাদু হয়তো নিরপরাধ, কিন্তু সে পলাইবে কেন ? ভয় পাইয়াছে ? আশ্চর্য নয় ; এরূপ একটা খুনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে কে না শঙ্কিত হয় ?'

এই সময়ে একটি ছোকরা বলিয়া উঠিল, 'ওই সদানন্দদা আসছে !'

সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফিরাইলাম। রাস্তা দিয়া একটি ভদ্রলোক আসিতেছেন। চেহারা গ্রাম্য হইলেও সাজ-পোশাক গ্রাম্য নয় ; গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং গরদের চাদর, পায়ে কালো বার্নিশ অ্যালবার্ট, হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ।

একটি ছোকরা চুপিচুপি অন্য এক ছোকরাকে বলিল, 'সদানন্দদা'র জামাকাপড়ের বাহার দেখেছিস ! নিশ্চয় কলকাতায় গেছল।'

সদানন্দবাবু সামনা-সামনি আসিলে পটল হাঁক দিয়া বলিল, 'সদানন্দদা, গাঁয়ের খবর শুনেছেন ?'

সদানন্দবাবু দাঁড়াইলেন, আমাকে এবং ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কী খবর ?'

পটল বলিল, 'অমরা মারা গেছে।'

সদানন্দবাবুর চোখে অকপট বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল, 'মারা গেছে ! কী হয়েছিল ?'

পটল বলিল, 'হয়নি কিছু। বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। কে মেরেছে কেউ জানে না।'

সদানন্দবাবুর মুখখানা ধীরে ধীরে পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেল, তিনি নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। পটল বলিল, 'আপনি এই এলেন, এখন বাড়ি যান। পরে সব শুনবেন।

সদানন্দবাবু ক্ষণেক দ্বিধা করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে প্রস্থান করিলেন।

তিনি দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ পটলকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সদানন্দবাবু যখন গ্রাম থেকে গিয়েছিলেন তখন তাঁর হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর স্টীলের ট্রাঙ্ক ছিল না ?'

পটল বলিল, 'ঠিক তো, হীরু মোড়ল তাই বলেছিল বটে। সদানন্দদা তোরঙ্গ কোথায় রেখে এলেন !'

এ প্রশ্নের সদুত্তর কাহারও জানা ছিল না। ব্যোমকেশ এদিক ওদিক চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে এল, আজ উঠি। সদানন্দবাবুর সঙ্গে দু' একটা কথা বলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু তিনি এইমাত্র ফিরেছেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইতে পাইল না, বিরাট বিস্ফোরণের শব্দে আমরা ক্ষণকালের জন্য হতচকিত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ একলাফে রাস্তায় নামিয়া সদানন্দ সুরের বাড়ির দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। আমরা তাহার পিছনে ছুটিলাম। শব্দটা ওই দিক হইতেই আসিয়াছে।

সদানন্দ সুরের বাড়ির সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিলাম, বাড়ির সদর দরজার কবাট সামনের চাতালের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সদানন্দ সুর রক্তাক্ত দেহে তাহার মধ্যে পড়িয়া আছেন। খানিকটা কটুগন্ধ ধূম সন্ধ্যার বাতাস লাগিয়া ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চার

ব্যোমকেশ ও আমি চাতালের উপর উঠিলাম, আর যাহারা আমাদের পিছনে আসিয়াছিল তাহার চাতালের কিনারায় দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চক্ষু গোল করিয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ সুর যে বাঁচিয়া নাই তাহা একবার দেখিয়াই বোঝা যায়। তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত অক্ষত বটে ; ডান হাতে তালা ও বাঁ হাতে চাবি দৃঢ়ভাবে ধরা রহিয়াছে ; কিন্তু মাথাটা প্রায় ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্টা দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে, রক্ত ও মগজ মাখামাখি হইয়া চূর্ণ খুলি হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে ; মুখের একপাশটা নাই। বীভৎস দৃশ্য। তিন মিনিট আগে যে-লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখিয়াছি, তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলে স্নায়বিক ত্রাসে শরীর কাঁপিয়া ওঠে, হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

গ্রামবাসীদের এতক্ষণ বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। পটল প্রথম কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইল ; কম্পিতস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, এসব কী হচ্ছে আমাদের গ্রামে !'

ব্যোমকেশ ভাঙা দরজার নিকট হইতে ঢালাই লোহার একটা টুকরা কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতেছিল, পটলের কথা বোধ হয় শুনতে পাইল না। লোহার টুকরা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'হ্যান্ড-গ্রিনেড ! ক্যাম্বিসের ব্যাগটা কোথায় গেল ?'

ব্যাগটা ছিন্নভিন্ন অবস্থায় একপাশে ছিটকাইয়া পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ গিয়া সেটার

অভ্যন্তরভাগে পরীক্ষা করিল। নূতন ও পুরাতন কয়েকটা জামাকাপড় রহিয়াছে। একটা নূতন টাইম-পীস ঘড়ি বিস্ফোরণের ধাক্কায় চ্যাপ্টা হইয়া গিয়াছে, একটা কেশতৈলের বোতল ভাঙিয়া কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গিয়াছে। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, তুমি বাইরে থাকো, আমি চট্ করে বাড়ির ভিতরটা দেখে আসি।'

শুধু যে দরজার কবাট ভাঙিয়া পড়িয়াছিল তাহাই নয়, দরজার উপরের খিলান খানিকটা উড়িয়া গিয়াছিল, কয়েকটা ইট বিপজ্জনকভাবে ঝুলিয়া ছিল। ব্যোমকেশ যখন লঘুপদে এই রন্ধ্র পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে কোথায় কোন্ ভয়াবহ মৃত্যু ওৎ পাতিয়া আছে কে জানে! ব্যোমকেশের যদি কিছু ঘটে, সত্যবতীর সামনে গিয়া দাঁড়াইব কোন্ মুখে?

'দাঁড়াও, আমিও আসছি'—বলিয়া আমি প্রাণ হাতে করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িলাম।

ব্যোমকেশ ঘাড়া ফিরাইয়া একটু হাসিল; বলিল, 'ভয়ের কিছু নেই। বিপদ যা ছিল তা সদানন্দ সুরের ওপর দিয়েই কেটে গিয়েছে।'

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, বাড়ির ভিতরে আলো অতি অল্প। বলিলাম, 'কি দেখবে চটপট দেখে নাও। দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে।'

বাড়ির সামনের দিকে দু'টি ঘর, পিছনে রান্নাঘর। কোনও ঘরেই লোভনীয় কিছু নাই। যে ঘরের দরজা ভাঙিয়াছিল সে-ঘরে কেবল একটি কোমর-ভাঙা তক্তপোশ আছে; পাশের ঘরে আর একটি তক্তপোশের উপর বালিশ-বিছানা দেখিয়া বোঝা যায় ইহা গৃহস্বামীর শয়নকক্ষ। একটা খোলা দেওয়াল-আলমারিতে কয়েকটা ময়লা জামাকাপড় ছাড়া আর কিছুই নাই।

রান্নাঘরও তথৈবচ। খানকয়েক থালা-বাটি, ঘটি-কলসী, হাঁড়িকুড়ি। উনুনটা অপরিষ্কার, তাহার গর্ভে ছাই জমিয়া আছে। সব দেখিয়া শুনিয়া বলিলাম, 'সদানন্দ সুরের অবস্থা ভালো ছিল না মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। ওই দরজাটা দেখেছ?' বলিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

কাছে গিয়া দেখিলাম। রান্নাঘরের এই দরজা দিয়া উঠানে যাইবার পথ। দরজা ভেজানো রহিয়াছে, টান দিতেই খুলিয়া গেল। বলিলাম, 'একি? দরজা খোলা ছিল!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর খুলে রেখে যাননি। হুড়কো লাগিয়ে গিয়েছিলেন। ভালো করে দ্যাখো।'

ভালো করিয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে হুড়কো ঝুলিতেছে, কিন্তু তাহার দৈর্ঘ্য বড়জোর হাতখানেক। বলিলাম, 'একি, এতটুকু হুড়কো!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝতে পারলে না? হুড়কোটা প্রমাণ মাপেরই ছিল এবং লাগানো ছিল। তারপর কেউ বাইরে থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে করাত ঢুকিয়ে ওটাকে কেটেছে, তারপর ঘরে ঢুকেছে। ওই দ্যাখো হুড়কোর বাকী অংশটা।' ব্যোমকেশ দেখাইল; উনানের পাশে জ্বালানী কাঠের সঙ্গে হুড়কোর বাকী অংশটা পড়িয়া আছে।

ব্যাপার কতক আন্দাজ করিতে পারিলেও সমগ্র পরিস্থিতি ধোঁয়াটে হইয়া রহিল। সদানন্দ সুরের কোনও শত্রু তাঁহার অনুপস্থিতিকালে হুড়কো কাটিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর? আজ বোমা ফাটিল কি করিয়া? কে বোমা ফাটাইল?

খোলা দরজা দিয়া আমরা উঠানে নামিলাম। পাঁচিল-ঘেরা উঠানের এককোণে কুয়া, অন্য

কোণে পেয়ারাগাছ। ব্যোমকেশ সিধা পেয়ারাগাছের কাছে গিয়া মাটি দেখিল। মাটিতে যে অস্পষ্ট দাগ রহিয়াছে তাহা হইতে আমি কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না, কিন্তু ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। যিনি এসেছিলেন তিনি এইখানেই পাঁচিল টপ্‌কেছিলেন।'

বলিলাম, 'তাই নাকি!' কিন্তু পাঁচিল টপ্‌কাবার কী দরকার ছিল? করাত দিয়ে খিড়কি-দোরের হুড়কো কাটল না কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খিড়কির হুড়কো করাত দিয়ে কাটলে খিড়কি-দরজা খোলা থাকত, কারুর চোখে পড়তে পারত। তাতে আগন্তুক মহাশয়ের অসুবিধা ছিল। আমি গোড়াতেই ভুল বুঝেছিলাম, নইলে সদানন্দ সুর মরতেন না।'

'কী ভুল বুঝেছিলে?'

'আমি সন্দেহ করেছিলাম, যাঁকে ধরতে এখানে এসেছি তিনি সদানন্দ সুর। কিন্তু তা নয়।—চল, এখন যাওয়া যাক। বাঘমারি গ্রামে আর কিছু দেখবার নেই।'

রান্নাঘরের ভিতর দিয়া আবার সদরে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং চাতালের নীচে ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে চাহিয়া আছে। মৃত্যু সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নাই।

ভিড়ের মধ্য হইতে পটল বলিয়া উঠিল, 'ব্যোমকেশবাবু, বাড়ির মধ্যে কী দেখলেন? কাউকে পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। পুলিসে খবর পাঠিয়েছ?'

পটল বলিল, 'না। আপনি আছেন তাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কেউ নয়, পুলিসকে খবর দিতে হবে। আচ্ছা, তোমাদের যেতে হবে না; আমরা তো যাচ্ছি, সুখময়বাবুকে খবর দিয়ে যাব।'

'আপনারা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। যতক্ষণ পুলিস না আসে ততক্ষণ তোমরা কয়েকজন এখানে থেকো।'

'পুলিস কি আজ রাত্রে আসবে?'

'আসবে।'

আমরা আবার রেল-লাইনের ধার দিয়া চলিয়াছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া চাঁদের আলো ফুটি-ফুটি করিতেছে। একটা মালগাড়ি দীর্ঘ দেহভার টানিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি এ-ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝেছ মনে হচ্ছে। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর সঙ্গে সদানন্দ সুরের মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এটা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ?'

'সম্বন্ধ আছে নাকি? কী সম্বন্ধ?'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'অমৃত বেচারা বেঘোরে মারা গেল। সে-রাত্রে যদি সে জঙ্গলে না যেত তাহলে মরত না। যে তাকে মেরেছে সে তাকে মারতে আসেনি।'

'তবে কাকে মারতে এসেছিল?'

'সদানন্দ সুরকে।'

'কিন্তু—সদানন্দ সুর তো তখন বাড়ি ছিলেন না।'

'ছিলেন না বলেই আততায়ী এসেছিল তাঁকে মারতে।'

'বড্ড বেশি রহস্যময় শোনাচ্ছে। অনেকটা কালিদাসের হেঁয়ালির মত—নেই তাই খাচ্ছ তুমি, থাকলে কোথায় পেতে!—কিন্তু যাক, আজ বোমা ফাটল কি করে?'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'বুবি-ট্র্যাপ্ কাকে বলে জানো?'

বলিলাম, 'কথাটা শুনেছি। ফাঁদ পাতা?'

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে একজন মারতে চেয়েছিল। সে যখন জানতে পারল সদানন্দ সুর বাইরে গেছেন, তখন একদিন সন্ধ্যের পর এসে পাঁচিল ডিঙিয়ে উঠোনে ঢুকল, দরজার হুড়কো করাত দিয়ে কেটে বাড়িতে ঢুকল, তারপর বন্ধ সদর-দরজার মাথায় এমনভাবে একটা বোমা সাজিয়ে রেখে গেল যে, দরজা খুললেই বোমা ফাটবে। আজ সদানন্দ সুর ফিরে এসে দরজা খুললেন, অমনি বোমা ফাটল। এবার বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝেছি। কিন্তু লোকটা কে?'

'এখনও নাম জানি না। কিন্তু তিনি অস্ত্রশস্ত্রের চোরাকারবার করেন এবং কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাত্রিবেলা যুদ্ধযাত্রা করেন। লোকটির নামধাম জানবার জন্যে আমার মনটাও বড় ব্যগ্র হয়েছে।'

সান্তালগোলায় পৌঁছিয়া দেখিলাম দিনের কর্ম-কোলাহল শান্ত হইয়াছে, বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ। থানা খোলা আছে, সুখময়বাবু টেবিলে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন। আমাদের পদশব্দে তিনি চোখ তুলিলেন, 'কী খবর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর গুরুতর। বাঘমারিতে আর একটা খুন হয়েছে।'

'খুন!' সুখময়বাবু চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'হ্যাঁ। সদানন্দ সুরকে আপনি চেনেন?'

সুখময়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া মাথা নাড়িলেন, 'হয়তো দেখেছি, মনে পড়ছে না। সদানন্দ সুর খুন হয়েছে? কিন্তু আপনি সকলের আগে এ-খবর পেলেন কোথা থেকে?'

'আমি বাঘমারিতে ছিলাম।'

সুখময়বাবুর মুখ হইতে ক্ষণেকের জন্য মিষ্টতর মুখোশ খসিয়া পড়িল, তিনি রূঢ়চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি বাঘমারিতে গিয়েছিলেন। আমি মানা করা সত্ত্বেও গিয়েছিলেন!'

ব্যোমকেশের দৃষ্টিও প্রখর হইয়া উঠিল, 'আপনি আমাকে মানা করবার কে?'

সুখময়বাবু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি এ এলাকার বড় দারোগা, পুলিসের কর্তা।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি পুলিসের হর্তাকর্তা বিধাতা হতে পারেন, কিন্তু আমাকে হুকুম দেবার মালিক আপনি নন। ইন্সপেক্টর সামন্ত, আমি সরকারের কাজে এখানে এসেছি। আপনার ওপর হুকুম আছে সবরকমে আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু সাহায্য করা দূরের কথা, আপনি পদে পদে বাগড়া দেবার চেষ্টা করছেন। আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ফের যদি আপনার এতটুকু বেচাল দেখি, আপনাকে এ-এলাকা ছাড়তে হবে। এমন কি চাকরি ছাড়াও বিচিত্র নয়।'

সুখময়বাবু বোধ করি ব্যোমকেশকে গোবেচারী মনে করিয়া এতটা দাপট দেখাইয়াছিলেন, এখন তাহাকে নিজমূর্তি ধারণ করিতে দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেলেন। তাঁহার মিষ্টতার মুখোশ পলকের মধ্যে আবার মুখে ফিরিয়া আসিল। তিনি কণ্ঠস্বরে বশংবদ দীনতা ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি কি-যে বলছি তার ঠিক নেই! আমাকে মাপ করুন, ব্যোমকেশবাবু। আজ বিকেল থেকে পেটে একটা ব্যথা ধরেছে, তাই মাথার ঠিক নেই।

আপনাকে হুকুম করব আমি ! ছি-ছি, কী বলেন আপনি ! আমি আপনার হুকুমের গোলাম। হে-হে।—তা সদানন্দ সুর খুন হয়েছে ?'

ব্যোমকেশের তখনও মেজাজ ঠাণ্ডা হয় নাই ; সে বলিল, 'অমৃতের মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি সে-রাত্রে তদন্ত করতে যাননি, পরদিন সকালবেলা গিয়েছিলেন। এ খবরটা আপনার ওপরওয়ালার কানে পৌঁছুলে তিনি কি করবেন তা বোধ হয় আপনার জানা আছে ?'

সুখময়বাবু কাকুতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'কি বলব ব্যোমকেশবাবু, সেদিনও কলিকের ব্যথা ধরেছিল, হে-হে, একেবারে পেড়ে ফেলেছিল। নইলে খুনের খবর পেয়ে যাব না, এ কি সম্ভব ! তা যাক্‌গে ও-কথা। এখন এই সদানন্দ সুর—। আমি এখনি বেরুচ্ছি। এই জমাদার, জল্‌দি ইধার আও ! হমারা ঘোড়া'পর জিন চড়ানে বোলো। তুম্ ভি তৈয়ার হো লেও। ভারী খুন হুয়া হ্যায়। আভি যানা পড়েগা।'

অতঃপর সুখময়বাবু রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। পাড়াগাঁয়ে পুলিসকে তদন্ত উপলক্ষে পথহীন মাঠে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, তাই বোধ করি তাহাদের ঘোড়ার ব্যবস্থা।

পাঁচ

পরদিন সকালবেলা প্রাতরাশের পর ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, স্টেশনে বেড়িয়ে আসা যাক।'

সকাল সাতটায় একটা ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, আর একটা ট্রেন আসিবে ঘণ্টা দুই পরে। স্টেশনে ভিড় নাই, প্রবেশদ্বারে টিকিট-চেকার নাই। স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু ছাড়া আর সকলেই বোধ করি এই অবকাশে নিজ নিজ কোয়ার্টারে চা খাইতে গিয়াছে।

হরিবিলাসবাবুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অজীর্ণ-জীর্ণ শরীর। ওজন করিয়া কথা বলেন, একটি কথা বলিবার আগে পাঁচবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন। আমাদের সহিত পরিচয় হইলেও অধিক বাক্য-বিনিময় হয় নাই। আমরা আসিয়া যখন শূন্য প্ল্যাটফর্মের উপর অলসভাবে পায়চারি করিতে লাগিলাম, তখন তিনি অফিস-ঘর হইতে চশমার উপর দিয়া আমাদের লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না।

ব্যোমকেশ অবশ্য প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিবার জন্য আসে নাই, সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল ; কিন্তু সে হরিবিলাসবাবুর কাছে গেল না। তাঁহার নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করা এবং খনির গর্ভ হইতে মণিমাণিক্য আহরণ সমান শ্রমসাপেক্ষ। তার চেয়ে অন্য কেহ যদি আসিয়া পড়ে—

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, টিকিট-চেকার মনোতোষ বোধ হয় নিজের কোয়ার্টার হইতে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, মুখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভারি তোখড় ছেলে, কথাবার্তায় চটপটে। বলিল, 'কী কাণ্ড, দাদা ! আপনার চোখের সামনে এই ব্যাপার হল—অ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবর পৌঁছে গেছে দেখছি !'

মনোতোষ বলিল, 'খবর পৌঁছবে না ! কাল রাত্রে দশটা সতরোর প্যাসেঞ্জার তখনও ইন্ হয়নি, খবর এসে হাজির। তা কী দেখলেন, দাদা ! দুম্ করে আপনার চোখের সামনে বোমা ফাটল ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক চোখের সামনে বোমা ফাটেনি, তবে কানের সামনে বটে। আপনি

সদানন্দ সুরকে চিনতেন ?'

'চিনতা না ! চারটে তিপান্নর গাড়ি থেকে নামলেন, আমাকে টিকিট দিয়ে ব্যাগ হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি শুধোলাম—কি দাদা, কলকাতা গেছলেন দেখছি, কেমন বেড়ালেন চেড়ালেন ? উনি হেসে বললেন—কলকাতা কি বেড়াবার জায়গা, সেখানে গিয়ে চেড়ালাম। এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। তখন কে জানতো আধঘণ্টাও কাটবে না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, সদানন্দ সুর যখন বাইরে গিয়েছিলেন তখন আপনি তাঁকে দেখেছিলেন ?'

মনোতোষ বলিল, 'দেখিনি ? আমার চোখ এড়িয়ে এ-ইস্টিশান থেকে কি কারুর বেরুবার জো আছে, দাদা। দিন আষ্টেক-দশ আগেকার কথা ; সকালবেলা আমাকে টিকিট দেখিয়ে ইস্টিশানে ঢুকলেন, সাতটা তিনের ডাউন প্যাসেঞ্জারে চলে গেলেন।'

'কলকাতার টিকিট ছিল ?'

'অ্যাঁ—তা তো ঠিক মনে পড়ছে না, দাদা। তবে কলকাতা ছাড়া আর কি হতে পারে !'

'কলকাতার দিকে অন্য স্টেশন হতে পারে।—সে যাক। তাঁর সঙ্গে কী কী মাল ছিল বলুন তো।'

'মাল !'—মনোতোষ একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল, 'যতদূর মনে পড়ছে, এক হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, অন্য হাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক ছিল। কেন বলুন তো ?'

'স্টীল-ট্রাঙ্কটা সদানন্দবাবু ফিরিয়ে আনেননি। তার মানে কোথাও রেখে এসেছিলেন। যাক, আপনি তো দেখছি লোকটিকে ভালোভাবেই চিনতেন। কেমন মানুষ ছিলেন তিনি ?'

'ঐটি বলতে পারব না, দাদা। পরচিত্ত অন্ধকার। তবে কথাবার্তায় ভালো ছিলেন। কারুর সাতে-পাঁচে থাকতেন না, নিজের ধান্দায় ঘুরতেন। মাসখানেক আগে আমাদের মাস্টারমশায়ের কাছে খুব যাতায়াত ছিল।'—বলিয়া স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে আঙুল দেখাইল।

'তাই নাকি ! কিসের জন্যে যাতায়াত ?'

'তা জানিনে, দাদা। দু'জনে মুখোমুখি বসে কী গুজ-গুজ ফুস্-ফুস্ করতেন ওঁরাই জানেন। আপনি মাস্টারমশাইকে শুধোন না।'

'হুঁ, তাই করি।'

হরিবিলাসবাবুর সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'মাস্টারমশাই, আসতে পারি ?'

হরিবিলাসবাবু এমনভাবে ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন যেন আমাদের চিনিতেই পারেন নাই। তারপর, কাজে বিঘ্ন করার জন্য বিরক্ত হইয়াছেন এমনিভাবে হাতের কলম রাখিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

আমরা ঘরে গিয়া বসিলাম। বহু খাতাপত্রে ভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড টেবিলের ওপারে তিনি, এপারে আমরা। ব্যোমকেশ বলিল, 'সদানন্দ সুর মারা গেছেন শুনেছেন বোধ হয় ?'

হরিবিলাসবাবু প্রশ্নটাকে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'শুনেছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর সঙ্গে আপনার জানাশোনা ছিল ?'

যেন এই কথার উত্তরের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে এমনিভাবে গভীর বিবেচনার পর হরিবিলাসবাবু বলিলেন, 'সামান্য জানাশোনা ছিল।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ অধীর কণ্ঠে বলিল, 'দেখুন, আপনি মনে করবেন না, নাহক কৌতূহলের বশেই আপনাকে প্রশ্ন করছি। অত্যন্ত ভয়াবহভাবে সদানন্দবাবুর মৃত্যু হয়েছে, আমি পুলিসের

পক্ষ থেকে তারই তদন্ত করতে এসেছি।—এখন বলুন, কোন্ সূত্রে সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছিল।'

হরিবিলাসবাবুর চোপ্‌সানো মুখ যেন আরও চুপ্‌সিয়া গেল। তিনি দু'চার বার গলা-ঝাড়া দিয়া অত্যন্ত দ্বিধাসঙ্কুল কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি প্রাণকেষ্ট পাল রেলের লাইন-ইন্সপেক্টর, তাঁর সঙ্গে আমার আগে থাকতে পরিচয় আছে। মাসকয়েক হল প্রাণকেষ্টবাবু এ-লাইনে এসেছেন ; রামডিহি জংশনে তাঁর হেড-কোয়ার্টার। ট্রলিতে চড়ে রেলের লাইন পরিদর্শন করে বেড়ানো তাঁর কাজ। কাজের উপলক্ষে সান্তালগোলা দিয়ে তিনি প্রায় যাতায়াত করেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়। একদিন প্রাণকেষ্টবাবু এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, এমন সময় সদানন্দবাবু প্ল্যাটফর্মে এলেন। প্রাণকেষ্টবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন ; বললেন—আমার সম্বন্ধী। সেই থেকে আমি সদানন্দবাবুকে চিনি।'

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, 'কতদিন আগের কথা ?'

'দু'-তিন মাস হবে।'

'প্রাণকেষ্টবাবু প্রায়ই এ-লাইনে যাতায়াত করেন ! শেষ কবে এসেছিলেন ?'

'চার-পাঁচ দিন আগে। স্টেশনে বেশিক্ষণ ছিলেন না, ট্রলিতে চড়ে লাইন দেখতে চলে গেলেন।'

'শালা-ভগিনীপতির মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল ?'

'ভেতরে কি ছিল জানি না, বাইরে সদ্ভাব ছিল।'

'যাক। তারপর থেকে সদানন্দ সুর আপনার কাছে যাতায়াত করতেন ? কী উপলক্ষে যাতায়াত করতেন ?'

হরিবিলাসবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরবে চিত্ত মন্থন করিয়া বলিলেন, 'সদানন্দবাবু দালাল ছিলেন, ছোটখাট জিনিসের দালালি করতেন। আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে দেখে তিনি আমাকে কবিরাজী চিকিৎসা করাবার জন্য ভজাচ্ছিলেন। দু'এক শিশি গছিয়েছিলেন ; হত্তুকী আর বিটনুন। তাতে কিছু হল না।'

হরি হরি, শেষে হরীতকী আর বিটনুন ! ব্যোমকেশ তবু প্রশ্ন করিল, 'এ ছাড়া সদানন্দ সুরের সঙ্গে আপনার আর কোনও সম্বন্ধ ছিল না ?'

'না।'

নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, 'আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিলাম। প্রাণকেষ্টবাবু এখন রামডিহি জংশনেই আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'নমস্কার।—চল, অজিত।'

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া বলিলাম, 'এবার কী ?'

ব্যোমাকেশ বলিল, 'ওবেলা রামডিহিতে গিয়ে প্রাণকেষ্ট পাল মহাশয়কে দর্শন করে আসতে হবে। তিনি শ্যালকের মৃত্যু-সংবাদ যদি বা এখনও না পেয়ে থাকেন, বিকেল নাগাদ নিশ্চয় পাবেন।—হরিবিলাসবাবুকে কেমন মনে হল ?'

বলিলাম, 'আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা। যেমন ঘুণ-ধরা চেহারা, তেমনি মরচে-ধরা বুদ্ধি। শূন্য সিন্দুকে ডবল তালা। তুমি যদি সন্দেহ করে থাকো যে উনি লুকিয়ে লুকিয়ে গোলা-বারুদের কালাবাজার করছেন, তাহলে ও-সন্দেহ ত্যাগ করতে পার। হরিবিলাসবাবুর একমাত্র গোলা হচ্ছে হরীতকী-খণ্ড, আর বারুদ—বিটনুন।'

ব্যোমকেশ হাসিল ; বলিল, 'চল, বাজারটা ঘুরে আসা যাক।'

'বাজারে কী দরকার ?'

'এসই না।'

গঞ্জের কর্মব্যস্ততা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক আড়তের সামনে মুক্তস্থানে বহু গরুর গাড়ির ঠেলাঠেলি, দুই-চারিটা ঘোড়ায়-টানা খোলা ট্রাক-জাতীয় গাড়িও আছে। প্রত্যেক গোলা হইতে 'রামে রাম দুইয়ে দুই' শব্দ উঠিতেছে। ডাঁই-করা কাঁচা-মাল পাঁচসেরি বাটখারায় ওজন হইতেছে।

একটি গোলায় এক বাঙালী যুবক দাঁড়াইয়া কাজকর্ম তদারক করিতেছিলেন, ব্যোমকেশ গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এটা নফর কুণ্ডু মশায়ের গোলা না ?'

ছোকরা বোধ হয় ব্যোমকেশের মুখ চিনিত, সসম্ভ্রমে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তাঁর ভাইপো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। কুণ্ডুমশাই কোথায় ?'

ছোকরা বলিল, 'আজ্ঞে, কাকা এখানে নেই, বাইরে গেছেন। কিছু দরকার আছে কি ?'

'দরকার এমন কিছু নয়। কোথায় গেছেন ?'

'আজ্ঞে, তা কিছু বলে যাননি।'

'তাই নাকি! কবে গেছেন ?'

'গত মঙ্গলবার বিকেলবেলা।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে আমার পানে চাহিল। আমার মনে পড়িয়া গেল, গেল গত সোমবারে আমি রামডিহি স্টেশনে গিয়া বেনামী চিঠি ডাকে দিয়া আসিয়াছিলাম। স্বাভাবিক নিয়মে চিঠি মঙ্গলবারে এখানে পৌঁছিয়াছে। নফর কুণ্ডুর নামেও একটি বেনামী চিঠি ছিল। তবে কি চিঠি পাইয়া পাখি উড়িয়াছে ? নফর কুণ্ডুই আমাদের অচিন পাখি ? কিন্তু সে যাই হোক, ভাইপো ছোকরা কিছু জানে বলিয়া মনে হয় না ; সরলভাবে সব কথার উত্তর দিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি কবে ফিরবেন তাও বোধ হয় জানা নেই ?'

'আজ্ঞে না, কিছু বলে যাননি।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'আচ্ছা, যেদিন নফরবাবু চলে যান সেদিন সকালে কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছিলেন ?'

ছোকরা বলিল, 'চিঠি রোজই দু'চারখানা আসে, সেদিনও এসেছিল।'

'হুঁ।'

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ব্যোমকেশ আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল, 'তোমাদের ক'টা ঘোড়া আছে ?'

ছোকরা অবাক্ হইয়া চাহিল, 'ঘোড়া!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোড়া। ওই যে ট্রাক টানে।' ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া পাশের গোলা দেখাইল।

যুবক বুঝিয়া বলিল, 'ও—না, আমাদের ঘোড়া-টানা ট্রাক নেই, গরুর গাড়িতে চলে যায়।'

এই সময় এক ইউনিফর্ম-পরা কনস্টেবল আসিয়া জোড়পায়ে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশকে স্যালুট করিল, 'হুজুর, দারোগাসাহেব সেলাম দিয়া হ্যায়।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিল ; বলিল, 'চল, যাচ্ছি।'

কাছেই থানা। সেই দিকে যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'সুখময় দারোগা কি রকম ফিচেল দেখেছ ? হাটের মাঝখানে কনস্টেবল পাঠিয়েছে, যাতে কারুর জানতে বাকি না থাকে যে পুলিসের সঙ্গে আমার ভারি দহরম মহরম।'

'হুঁ। কিন্তু তলব কিসের জন্যে ?'

'বোধ হয় অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এসেছে।'

থানায় পদার্পণ করিতেই সুখময় দারোগা মুখে মধুর রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন, 'আসুন, আসুন ব্যোমকেশবাবু, আসুন অজিতবাবু, বসুন বসুন। ব্যোমকেশবাবু, আপনি এই চেয়ারটাতে বসুন। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ নজরে পড়ল আপনারা এদিকে আসছেন। হে-হে, এই নিন অমৃতের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট। বুদ্ধি বটে আপনার ; ঠিক ধরেছিলেন, বন্দুকের গুলিতেই মরেছে।' বলিয়া ডাক্তারের রিপোর্ট ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।

বিচিত্র জীব এই সুখময়বাবু। এইরূপ চরিত্র আমরা সকলেই দেখিয়াছি এবং মনে মনে সহিংস তারিফ করিয়াছি। কিন্তু ভালবাসিতে পারি নাই। ইঁহারা কেবল পুলিস-বিভাগে নয়, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়াইয়া আছেন।

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'গুলিটা শরীরের মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে দেখছি। কোথায় সেটা ?'

'এই যে !' একটা নম্বর-আঁটা টিনের কৌটা হইতে মাষকলাইয়ের মত একটি সীসার টুকরা লইয়া সুখময়বাবু তাহার হাতে দিলেন।

করতলে গুলিটি রাখিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেটিকে সমীক্ষণ করিল, তারপর সুখময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ থেকে কিছু বুঝলেন ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে, গুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে পিস্তল কিংবা রিভলবারের গুলি। এ ছাড়া বোঝবার আর কিছু আছে কি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে বৈকি। গুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে ·৩৮ অটোম্যাটিক থেকে গুলি বেরিয়েছে, যে ·৩৮ অটোম্যাটিক যুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্য ব্যবহার করত। অর্থাৎ—' ব্যোমকেশ থামিল।

সুখময়বাবু বলিলেন, 'অর্থাৎ অমৃতকে যে খুন করেছে এবং আপনি যাকে খুঁজতে এসেছেন তাদের মধ্যে যোগাযোগ আছে, এমন কি তারা একই লোক হতে পারে। কেমন ?'

ব্যোমকেশ গুলিটি তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল, 'এ বিষয়ে আমার কিছু না বলাই ভালো। আপনার কাজ অমৃতের হত্যাকারীকে ধরা, সে-কাজ আপনি করবেন। আমার কাজ অন্য।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই। হ্যাঁ ভালো কথা, সদানন্দ সুরের লাশ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি, রিপোর্ট এলেই আপনাকে দেখাব।'

'আমাকে সদানন্দ সুরের রিপোর্ট দেখানোর দরকার নেই। এটাও আপনারই কেস্, আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। আমি রুই-কাতলা ধরতে এসেছি, চুনোপুঁটিতে আমার দরকার কি বলুন।'

সুখময়বাবুর চক্ষু দুটি ধূর্ত কৌতুকে ভরিয়া উঠিল, 'তিনি বলিলেন, 'সে-কথা একশো বার। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, আপনার জালে যখন রুই-কাতলা উঠবে তখন আমার চুনোপুঁটিও সেই জালেই উঠবে ; আমাকে আলাদা জাল ফেলতে হবে না। হে হে হে হে। চললেন

নাকি ? আচ্ছা, নমস্কার।'

বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। লোকটার দুষ্টবুদ্ধির শেষ নাই, অথচ তাহার কার্যকলাপে না হাসিয়াও থাকা যায় না। ব্যোমকেশ বলিল, 'এখনও রোদ চড়েনি, চলো চালের কল দুটো দেখে যাই।'

রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া বিশ্বনাথ রাইস মিল-এর সম্মুখে উপস্থিত হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। বেশ বড় চালের কল, পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রসারিত ; কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া ঘেরা। গুর্খা-রক্ষিত ফটক দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই সামনে প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো চাতাল চোখে পড়ে। চাতালের ওপারে একটি পুকুর, বাঁ পাশে ইঞ্জিন-ঘর ও ধান-ভানার করোগেটের ছাউনি ; ডান পাশে গুদাম, দপ্তর ও মালিকের থাকিবার জন্য একসারি কক্ষ। সকালবেলা কাজ চালু আছে, ধান-ভানার ছাউনি হইতে ছড় ছড় ছর্‌র্‌র শব্দ আসিতেছে। কুলি-মজুরেরা কাজে ব্যস্ত, গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার ট্রাক হইতে বস্তা ওঠা-নামা হইতেছে।

চাল কলের মালিকের নাম বিশ্বনাথ মল্লিক। থানা হইতে তাঁহার নাম সংগ্রহ করিলেও এবং বেনামী চিঠি পাঠাইলেও চাক্ষুষ পরিচয় এখনও হয় নাই। আমরা গুর্খার মারফত এত্তালা পাঠাইয়া মিল-এ প্রবেশ করিলাম। দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম বিশ্বনাথবাবু সেখানে নাই, একজন মুহুরী গোছের লোক গদিতে বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে।

'কী চান ?'

'বিশ্বনাথবাবু আছেন ? আমরা পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি।'

লোকটি তটস্থ হইয়া উঠিল, 'আসুন আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক। কর্তা মিল-এর কাজ তদারক করতে গেছেন, এখনি আসবেন। তাঁকে খবর পাঠাব কি ?'

ঘরের অর্ধেক মেঝে জুড়িয়া গদির বিছানা, আমরা গদির উপর উপবেশন করিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আধুনিক চেয়ার-সোফার চেয়ে সাবেক গদি-ফরাশ ঢের বেশি আরামের। ব্যোমকেশ একটি সুপুষ্ট তাকিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, 'না না, তাঁকে ডেকে পাঠানোর দরকার নেই। সামান্য দু'-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার আছে, তা সে আপনিই বলতে পারবেন। আপনি বুঝি মিল-এর হিসেব রাখেন ?'

লোকটি সবিনয়ে হস্তঘর্ষণ করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি মিল-এর নায়েব-সরকার। অধীনের নাম নীলকণ্ঠ অধিকারী। আপনি কি ব্যোমকেশ বক্সী মশাই ?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। নীলকণ্ঠ অধিকারী ভক্তি-তদ্‌গত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এমন লোক আছে পুলিসের নাম শুনিলে যাহাদের হৃদয় বিগলিত হয়। উপরন্তু তাহারা যদি ব্যোমকেশ বক্সীর নাম শুনিতে পায় তাহা হইলে তাহাদের হৃদয়াবেগ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত দু'কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন আর তাহাদের ঠেকাইয়া রাখা যায় না। নীলকণ্ঠ অধিকারী সেই জাতীয় লোক। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, ব্যোমকেশকে অদেয় তাহার কিছুই নাই ; প্রশ্নের উত্তর সে দিবেই, এমন কি, প্রশ্ন না করিলেও সে উত্তর দিবে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাকে দেখে কাজের লোক মনে হচ্ছে। মিল-এর সব কাজ আপনিই দেখেন ?'

নীলকণ্ঠ সহর্ষে হস্তঘর্ষণ করিল, 'আজ্ঞে, কর্তাও দেখেন। উনি যখন থাকেন না তখন আমার ওপরেই সব ভার পড়ে।'

'কর্তা—মানে বিশ্বনাথবাবু—এখানে থাকেন না ?'

'আজ্ঞে, এখানেই থাকেন। তবে মিল-এর কাজকর্ম যখন কম থাকে তখন দু'চার দিনের

জন্য কলকাতা যান। কলকাতায় কর্তার ফ্যামিলি থাকেন।'

'বুঝেছি। তা কর্তা কতদিন কলকাতা যাননি ?'

'মাসখানেক হবে। এখন কাজের চাপ বেশি—'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। অমৃত নামে বাঘমারি গ্রামের একটি ছোকরা সম্প্রতি মারা গেছে তাকে আপনি চিনতেন ?'

নীলকণ্ঠ উৎসুক স্বরে বলিল, 'চিনতাম বৈকি। অমৃত প্রায়ই কর্তার কাছে চাকরির জন্য দরবার করতে আসত। কিন্তু—'

'সদানন্দ সুরকেও আপনি চিনতেন ?'

নীলকণ্ঠ সংহত স্বরে বলিল, 'সদানন্দবাবু কাল রাত্রে বোমা ফেটে মারা গেছেন, আজ সকালে খবর পেয়েছি। সদানন্দবাবুকে ভালোরকম চিনতাম। আমাদের এখানে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল।'

'কী উপলক্ষে যাতায়াত ছিল ?'

'উপলক্ষ—কর্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝে মাঝে গদিতে এসে বসতেন, তামাক খেতেন, কর্তার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্পগাছা করতেন। এর বেশি উপলক্ষ কিছু ছিল না। তবে—' বলিয়া নীলকণ্ঠ থামিল।

'অর্থাৎ মোসায়েবি করতেন। তবে কি ?'

'দিন দশেক আগে তিনি কর্তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করেছিলেন।'

'তাই নাকি ! কত টাকা ?'

'পাঁচশো।'

'হ্যান্ডনোট লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে না। কর্তা সদানন্দবাবুকে বিশ্বাস করতেন, বহিখাতায় সদানন্দবাবুর নামে পাঁচশো টাকা কর্জ লিখে টাকা দেওয়া হয়েছিল। টাকাটা বোধহয় ডুবল।' বলিয়া নীলকণ্ঠ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। কি ভাবিল জানি না, কিন্তু খানিক পরে বাহির হইতে ঘোড়ার চিঁহি-চিঁহি শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভালো কথা, অনেকগুলো ঘোড়া দেখলাম। সবগুলোই কি আপনাদের ?'

নীলকণ্ঠ সোৎসাহে বলিল, 'আজ্ঞে, সব আমাদের। কর্তার খুব ঘোড়ার শখ। ন'টা ঘোড়া আছে।'

'তাই নাকি ! এতগুলো ঘোড়া কি করে ? ট্রাক টানে ?'

'ট্রাক তো টানেই। তা ছাড়া কর্তা নিজে ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসেন। উনি কমবয়সে জকি ছিলেন কিনা—'

'নীলকণ্ঠ !—'

শব্দটা আমাদের পিছন দিক হইতে চাবুকের মত আসিয়া নীলকণ্ঠের মুখে পড়িল। নীলকণ্ঠ ভীতমুখে চুপ করিল, আমরা একসঙ্গে পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম।

দ্বারের সম্মুখে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আন্দাজ চল্লিশ, ক্ষীণ-খর্ব চেহারা, অস্থিসার মুখে বড় বড় চোখ, হাফ-প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা শরীরে বিকলতা কিছু না থাকিলেও, জঙ্ঘার হাড়-দু'টি ধনুকের মতো বাঁকা। ইনিই যে মিল-এর মালিক ভূতপূর্ব জকি বিশ্বনাথ মল্লিক তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলাম।

বিশ্বনাথ মল্লিক নীলকণ্ঠের দিকেই চাহিয়া ছিলেন, পলকের জন্যও আমাদের দিকে চক্ষু

ফিরান নাই। এখন তিনি ঘরের মধ্যে দুই পা অগ্রসর হইয়া আগের মতই শাণিত কণ্ঠে নীলকণ্ঠকে বলিলেন, 'ইস্টিশানে মাল চালান যাচ্ছে, তুমি তদারক করো গিয়ে।'

নীলকণ্ঠ কশাহত ঘোড়ার মত ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এইবার বিশ্বনাথ মল্লিক আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন। তাঁহার মুখ হইতে মালিক-সুলভ কঠোরতা অপগত হইয়া একটু হাসির আভাস দেখা দিল। তিনি সহজ সুরে বলিলেন, 'নীলকণ্ঠ বড় বেশি কথা কয়। আমি আগে জকি ছিলাম, সেই খবর আপনাদের শোনাচ্ছিল বুঝি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'ঘোড়ার কথা থেকে জকির কথা উঠে পড়ল।'

বিশ্বনাথবাবু মুখে সহাস্য ভঙ্গী করিলেন, 'নিজের লজ্জাকর অতীতের কথা সবাই চাপা দিতে চায়, আমার কিন্তু লজ্জা নেই। বরং দুঃখ আছে, যদি জকির কাজ ছেড়ে না দিতাম, এতদিনে হয়তো ভীম সিং কি খাদে হয়ে দাঁড়াতাম। কিন্তু ও-কথা যাক। আপনি ব্যোমকেশবাবু—না? সদানন্দ সুরের মৃত্যু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে এসেছেন? আসুন, আমার বসবার ঘরে যাওয়া যাক।'

সাত

বিশু মল্লিকের খাস কামরাটি আধুনিক প্রথায় টেবিল চেয়ার দিয়া সাজানো, বেশ ফিটফাট। আমরা উপবেশন করিলে তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে সিগারেটের টিন বাহির করিয়া দিলেন।

বিশু মল্লিকের চেহারাটি অকিঞ্চিৎকর বটে, কিন্তু তাঁহার আচার-ব্যবহারে বেশ একটি আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, চোখ দু'টির অন্তরালে সজাগ শক্তিশালী মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছে তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া তিনি নিজে সিগারেট ধরাইলেন। টেবিলের সামনের দিকে বসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি জন্যে সান্তালগোলায় এসেছেন তা আমি জানি। বোধহয় এখানকার সকলেই জানে। এখন বলুন আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। অবশ্য নীলকণ্ঠের কাছে আমার সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছেন। যদি আমাকেই গোলাবারুদের আসামী বলে সন্দেহ করেন তাহলে আমার মিল খুঁজে দেখতে পারেন, আমার কোনও আপত্তি নেই।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'খোঁজাখুঁজির কথা পরে হবে। এখন আমার একটি ব্যক্তিগত কৌতূহল চরিতার্থ করুন। জকির কাজ ছেড়ে চালের কল করলেন কেন? যতদূর জানি জকির কাজে পয়সা আছে।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'পয়সা অবশ্য আছে কিন্তু বড় কড়াকড়ির জীবন, ব্যোমকেশবাবু। কখন ওজন বেড়ে যাবে এই ভয়ে আধ-পেটা খেয়ে জীবন কাটাতে হয়। আরও অনেক বায়নাক্কা আছে। আমার পোষাল না। কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, তাই দিয়ে যুদ্ধের আগে এই মিল খুলে বসলাম। তা, বলতে নেই, মন্দ চলছে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু ঘোড়ার মোহ ছাড়তে পারলেন না। এখানেও অনেকগুলি ঘোড়া পুষেছেন দেখলাম।'

বিশুবাবু ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আমি ঘোড়া ভালবাসি। অমন বুদ্ধিমান প্রভুভক্ত জানোয়ার আর নেই। মানুষের প্রকৃত বন্ধু যদি কেউ থাকে সে কুকুর নয়, ঘোড়া।'

'তা বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'আমারও কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভাল লাগে। কত রঙের ঘোড়াই আছে ; লাল সাদা কালো। তবে এদেশে লাল ঘোড়াই বেশি দেখা যায়, সাদা কালো তত বেশি নয়। এই দেখুন না, সান্তালগোলাতেই কত ঘোড়া চোখে পড়ল, কিন্তু সাদা বা কালো ঘোড়া একটাও দেখলাম না।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। সাদা ঘোড়া এখানে একটাও নেই। তবে একটা কালো ঘোড়া আছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর।'

'বদ্রিদাস—সে কে ?'

'এখানে আর-একটা চালের কল আছে, তার মালিক বদ্রিদাস গিরধরলাল। তার কয়েকটা ঘোড়া আছে, তাদের মধ্যে একটা ঘোড়া কালো।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের শেষাংশ অ্যাশ-ট্রেতে ঘসিয়া নিভাইয়া দিল। ঘোড়া সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে এমনি নিরুৎসুক স্বরে বলিল, 'কালো ঘোড়া আছে তাহলে।—যাক, এবার কাজের কথা বলি। আপনার কর্মচারীর কাছে কিছু খবর পেয়েছি, সে-সব কথা আবার জিজ্ঞেস করে সময় নষ্ট করব না। সদানন্দ সুরের মৃত্যু-সংবাদ আপনি পেয়েছেন। ঘটনাক্রমে আমি তখন বাঘমারি গ্রামে ছিলাম। ভয়াবহ মৃত্যু।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'শুনেছি বোমা ফেটে মৃত্যু হয়েছে। আপনি দেখেছিলেন ?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে মৃত্যুর বিবরণ দিয়া বলিল, 'এখন শুধু সদানন্দ সুরের মৃত্যুর কিনারা নয়, বোমারও কিনারা করতে হবে। আপনি বুদ্ধিমান লোক, এবিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।'

'কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।'

'আপনি এখানে অনেক দিন আছেন, এখানকার ঘাঁৎঘোঁৎ জানা আছে। মার্কিন সিপাহীর দল যখন এখানে ছিল, তখন আপনিও ছিলেন। আপনি বলতে পারেন কারা মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে যাতায়াত করত ?'

বিশুবাবু কিছুক্ষণ নতনেত্রে চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'মার্কিন সিপাহীদের ছাউনিতে কারুর যাতায়াত ছিল কিনা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তাদের সর্বত্র যাতায়াত ছিল। ভারি মিশুক লোক ছিল তারা, আমার মিল-এও অনেকবার এসেছে।'

'হুঁ। তারা আপনার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল কি ?'

বিশুবাবু একটু গম্ভীর হাসিলেন, 'করেছিল। একজন সার্জেন্ট একটা পিস্তল বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল। আমি কিনিনি।'

'আপনি কেনেননি, আর কেউ কিনেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারেন ?'

'কিছু না। আন্দাজ করতে পারলে অনেক আগেই আপনাদের খবর দিতাম, ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া কিছুক্ষণ নীরবে টানিল, 'আচ্ছা, আর একটা কথা। সান্তালগোলা ছোট জায়গা, এখানে মারণাস্ত্রগুলো যদি কেউ লুকিয়ে রাখতে চায় তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখবে আপনি অনুমান করতে পারেন ?'

বিশুবাবু আবার কিছুক্ষণ চক্ষু নত করিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন, 'আপনার বিশ্বাস মারণাস্ত্রগুলো সান্তালগোলাতেই আছে। কিন্তু তা নাও হতে পারে।'

'মনে করুন সান্তালগোলাতেই আছে।'

'বেশ, মনে করলাম। কিন্তু অস্ত্রগুলোর আয়তন কতখানি, ক'টা বন্দুক ক'টা বোমা, এসব

তো কিছুই জানি না। কি করে অনুমান করব ? আমার মনে হয় পুলিস যদি সান্তালগোলার সমস্ত বাড়ি, সমস্ত গোলা আর চালের কল একসঙ্গে খানাতল্লাশ করে তাহলে হয়তো অস্ত্রগুলো বেরুতে পারে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'তা কি সম্ভব ! আর যদি সম্ভব হত তাহলেও একটা কথা ভেবে দেখুন। যে-ব্যক্তি এই কাজ করছে সে নির্বোধ নয়, সে কি এমন জায়গায় মাল রাখবে যেখানে পুলিস সহজেই খুঁজে বার করতে পারে ? আমার তা মনে হয় না। লোকটি যদি এত নির্বোধ হত তাহলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত।'

বিশুবাবু উৎসুক স্বরে বলিলেন, 'তাহলে আপনার কী মনে হয় ? কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে ?'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এমন জায়গায় রেখেছে যেখানে কারুর যেতে মানা নেই, অথচ কেউ যায় না, যেখানে দৈবাৎ মাল পাওয়া গেলেও প্রমাণ করা যাবে না কে রেখেছে ?'

বিশুবাবু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'অর্থাৎ— ?'

ব্যোমকেশ পিছনের খোলা জানলা দিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, 'অর্থাৎ ওই জঙ্গল। ওখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কয়েকটা পিস্তল আর হ্যান্ড-গ্রিনেড পুঁতে রাখা খুব শক্ত কাজ নয়, কিন্তু খুঁজে বার করা অসম্ভব। যদি বা খুঁজে বার করলেন, কে পুঁতেছে কি করে প্রমাণ করবেন ?'

বিশুবাবু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক, ঠিক। জঙ্গলের কথাটা আমার মাথায় আসেনি। নিশ্চয় জঙ্গলে কোথাও পোঁতা আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। কিন্তু ভুল হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

বিশুবাবু বলিলেন, 'না ব্যোমকেশবাবু, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বিশ্বাস আর দেরি না করে জঙ্গলটা খুঁজে দেখা দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই করতে হবে। তবে জঙ্গল তো একটুখানি জায়গা নয়, খুঁজতে সময় লাগবে। অনেক লোকও লাগবে। আজ আর হবে না, কাল—'

এই পর্যন্ত বলিয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল। এতক্ষণ সে অসতর্কভাবে কথা বলিতেছিল, এখন যেন রাশ টানিয়া নিজেকে সংযত করিল ; বিশুবাবুর পানে তীক্ষ্ণভাবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'বিশ্বনাথবাবু, আজ আপনাকে বিশ্বাস করে এমন কথা কিছু বললাম যা বাইরের লোকের কাছে বক্তব্য নয়। আপনি বিশ্বাসযোগ্য লোক বলেই বলেছি। আশা করি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।'

বিশ্বনাথবাবু বলিলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরুবে না। উঠছেন নাকি ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আজ উঠি। একবার ঐ মাড়োয়ারী—কি নাম ?—বদ্রিদাসের মিল-এ যাব। দেখি যদি ওর কাছে কিছু খবর পাওয়া যায়। বিকেলে আবার রামডিহি যেতে হবে, সেখানে সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি থাকেন।—আচ্ছা, সদানন্দবাবু যে আপনার কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, কি জন্যে ধার চান কিছু বলেছিলেন কি ?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে কবিরাজী ওষুধের একটা দোকান খোলা। কিন্তু তাঁর মূলধন ছিল না, আমার কাছে ধার চেয়েছিলেন। লোকটি গরীব হলেও সজ্জন ছিলেন, আমি টাকা দিয়েছিলাম। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয় টাকা শোধ দিতেন, কিন্তু— ! যাকগে, ও-ক'টা টাকার জন্যে আমার দুঃখ নেই। আমি শুধু ভাবছি, সদানন্দবাবুর মতো নিরীহ

লোককে কে খুন করল ? কেন খুন করল ? তবে কি তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন জীবন ছিল ? বাইরে থেকে যা দেখা যেত সেটা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ নয় ?

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়তো তাই। এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজ বিকেলে তাঁর ভগিনীপতির সঙ্গে দেখা হলে হয়তো তাঁর প্রকৃত চরিত্র বোঝা যাবে। আচ্ছা, আজ চলি, আবার দেখা হবে।'

দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া গেল, বিশুবাবুর পাশে দাঁড়াইয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল, 'একটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি। আপনি কি সম্প্রতি কোনো বেনামী চিঠি পেয়েছেন ?'

বিশুবাবু চকিতে মুখ তুলিলেন, 'পেয়েছি। আপনি কি করে জানলেন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আরও দু'একজন পেয়েছে, তাই মনে হল হয়তো আপনিও পেয়েছেন। কী আছে বেনামী চিঠিতে ? ভয় দেখানো ?'

'এই-যে দেখুন না'—বলিয়া বিশুবাবু দেরাজ হইতে আমাদেরই লেখা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ মনোযোগ দিয়া চিঠি পড়িল, তারপর চিঠি ফেরত দিয়া বলিল, 'হুঁ। কে লিখেছে কিছু আন্দাজ করতে পারেন না ?'

বিশুবাবু বলিলেন, 'কিছু না। আমার জীবনে এমন কোনও গুপ্তকথা নেই যা ভাঙিয়ে কেউ লাভ করতে পারে ?'

'আপনার শত্রু কেউ আছে ?'

'অনেক। ব্যবসাদারের সবাই শত্রু।'

'তাহলে তারাই কেউ হয়তো নিছক mischief করবার জন্যে চিঠি দিয়েছে।—চলি এবার। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বিশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার মিল তাহলে সার্চ করছেন না ?'

ব্যোমকেশও হাসিল, 'অনর্থক পণ্ডশ্রম করে লাভ কি, বিশ্বনাথবাবু ?'

'আর জঙ্গল ?'

'সেটাও আজ নয়—জঙ্গল আপাদমস্তক খুঁজতে অনেক কাঠ-খড় চাই। এস অজিত, রোদ ক্রমেই কড়া হচ্ছে। বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে দু'টো কথা বলে চট্‌পট আস্তানায় ফিরতে হবে।'

আট

বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর সঙ্গে আলাপ করিয়া কিন্তু সুখ হইল না।

মাড়োয়ারীদের মধ্যে প্রধানত দুই শ্রেণীর চেহারা দেখা যায় ; এক, পাতিহাঁসের মত মোটা আর বেঁটে ; দুই, বকের মত সরু আর লম্বা। বদ্রিদাসের আকৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর। তাঁহার চালের কলটি আকারে প্রকারে বিশুবাবুর মিল-এর অনুরূপ ; সেই ধান শুকাইবার মেঝে, সেই পুকুর, সেই ইঞ্জিন-ঘর, সেই ফটকের সামনে গুর্খা দারোয়ান। পৃথিবীর সমস্ত চাল কলের মধ্যে বোধ করি আকৃতিগত ভ্রাতৃসম্বন্ধ আছে।

বদ্রিদাসের বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। নিজের গদিতে বসিয়া খবরের কাগজ হইতে তেজি-মন্দার হাল জানিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া এবং পরিচয় শুনিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি গলা উঁচু করিয়া ঘরের আনাচে-কানাচে চকিত ক্ষিপ্র নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে পলকের তরেও দৃষ্টি বিনিময় করিলেন

না। ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত এবং নেতিবাচক। পুরা সওয়াল জবাব উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই, নমুনাস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

'আপনি অমৃতকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'সদানন্দ সুরকে চিনতেন?'

'নেহি।'

'বেনামী চিঠি পেয়েছেন?'

'নেহি।'

'আপনার কলো রঙের ঘোড়া আছে?'

'নেহি।'

আরও কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, কঠিন দৃষ্টিতে বদ্রিদাসকে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'আজ চললাম, কিন্তু আবার আসব। এবার ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব, আপনার মিল সার্চ করব।'

বদ্রিদাস এককথার মানুষ, দু'রকম কথা বলেন না। বলিলেন, 'নেহি, নেহি।'

উত্ত্যক্ত হইয়া চলিয়া আসিলাম। ফটকের বাহিরে পা দিয়াছি, একটি শীর্ণকায় বাঙালী আসিয়া আমাদের ধরিয়া ফেলিল; পানের রসে আরক্ত দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'আপনি ব্যোমকেশবাবু? বদ্রিদাসকে সওয়াল করছিলেন?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আপনি জানলেন কি করে? ঘরে তো কেউ ছিল না।'

রক্তদন্ত আরও প্রকট করিয়া লোকটি বলিল, 'আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। বদ্রিদাস আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। সে অমৃতকে চিনত, সদানন্দ সুরকে চিনত, বেনামী চিঠি পেয়েছে, ওর কালো রঙের একটা ঘোড়া আছে। ভারি ধূর্ত মাড়োয়ারী, পেটেপেটে শয়তানি।'

ব্যোমকেশ লোকটিকে কিছুক্ষণ শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম রাখাল দাস। মাড়োয়ারীর গদিতে কাজ করি।'

'আপনার চাকরি যাবার ভয় নেই?'

'চাকরি গিয়েছে। বদ্রিদাস লুটিস্ দিয়েছে, এই মাসের শেষেই চাকরি খালাস।'

'নোটিস দিয়েছে কেন?'

'মুলুক থেকে ওর জাতভাই এসেছে, তাকেই আমার জায়গায় বসাবে। বাঙালী রাখবে না।'

আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। লোকটা আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিল, 'মনে রাখবেন ব্যোমকেশবাবু, পাজির পা-ঝাড়া ওই বদ্রিদাস। ওর অসাধ্যি কর্ম নেই। জাল জুচ্চুরি কালাবাজার—'

ব্যোমকেশ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, হাত নাড়িয়া তাহাকে বিদায় করিল।

বিশ্রান্তিগৃহে ফিরিয়া ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় লম্বা হইল, ঊর্ধ্বে চাহিয়া বোধকরি ভগবানের উদ্দেশে বলিল, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি!'

আমি জামা খুলিয়া বিছানার পাশে বসিলাম; বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, অনেক লোকের সঙ্গেই তো মুলাকাৎ করলে। কিছু বুঝলে?'

সে বলিল, 'বুঝেছি সবই। কিন্তু লোকটিকে যতক্ষণ নিঃসংশয়ে চিনতে না পারছি ততক্ষণ বোঝাবুঝির কোনও মানে হয় না।'

'কালো ঘোড়ার ব্যাপারটা কি ? বদ্রিদাসের যদি কালো ঘোড়া থাকেই তাতে কী ?'

ব্যোমকেশ কতক নিজ মনে বলিল, 'খট্‌কা লাগছে। বদ্রিদাসের কালো ঘোড়া—খট্‌কা লাগছে !'

'তোমার ধারণা হত্যাকারী কালো ঘোড়ায় চড়ে সদানন্দ সুরকে খুন করতে গিয়েছিল। কিন্তু কেন ? ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে লাভ কি ?'

'লাভ আছে, কিন্তু লোকসানও আছে। তাই ভাবছি—। যাক।' সে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, 'বিশ্বনাথ মল্লিককে কেমন দেখলে ?'

বলিলাম, 'জকি ছিলেন, কুকুরের চেয়ে ঘোড়া ভালবাসেন ; এ থেকে ভালোমন্দ কিছু বুঝলাম না। কিন্তু ওঁকে হাঁড়ির খবর দেওয়া কি উচিত হয়েছে ? মনে করো, জঙ্গল সার্চ করার কথাটা যদি বেরিয়ে যায় ! আসামী সাবধান হবে না ?'

ব্যোমকেশ একটু বিমনাভাবে বলিল, 'হুঁ। কিন্তু আমি তাঁকে চেতিয়ে দিয়েছি, আমার বিশ্বাস তিনি কাউকে বলবেন না।'

'কিন্তু যদি মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায় !'

'তাহলে ভাবনার কথা বটে।—যাক, নীলকণ্ঠ অধিকারীকেও বেশ সরল প্রকৃতির লোক বলে মনে হয়। ভারি প্রভুভক্ত, কী বলো ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাখাল দাস ?'

'ও একটা ছুঁচো। বদ্রিদাস তাড়িয়ে দিয়েছে, তাই গায়ের ঝাল মেটাতে এসেছিল।'

'কিন্তু ওর কথাগুলো কি মিথ্যে ?'

'না, সব সত্যি।'

দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা সারাক্ষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। উদ্বেগের হেতুটা কিন্তু ঠিক ধরিতে পারিলাম না।

বেলা সাড়ে চারটের সময় রামডিহি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। পৌনে-পাঁচটায় গাড়ি, পাঁচটা বাজিয়া দশ মিনিটে রামডিহি পৌঁছিবে। প্রাণকেষ্ট পালের সহিত সদালাপ করিয়া ফিরিতে বেশি রাত হইবে না।

টিকিট কিনিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলাম। ফটকে মনোতোষ টিকিট চেক্ করিয়া মিটিমিটি হাসিল, 'ফিরছেন কখন ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ন'টা-দশটা হবে।'

প্ল্যাটফর্মে কিছু যাত্রী সমাগম হইয়াছে। ট্রেন আসিতে মিনিট পাঁচেক দেরি আছে। এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরাইতে চোখে পড়িল ক্ষীণাঙ্গ স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবুর অফিসের সামনে পীনাঙ্গ দারোগা সুখময়বাবু তাঁহার সহিত সতর্কভাবে কথা বলিতেছেন। সুখময়বাবু আমাদের দেখিতে পাইয়া হাত নাড়িলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহার চোখে অনুসন্ধিৎসার ঝিলিক।

'কোথাও যাচ্ছেন নাকি ?'

'রামডিহি যাব, একটু কাজ আছে। আপনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'আমি কোথাও যাব না। একজনকে এগিয়ে নিতে এসেছি। এই ট্রেনেই তিনি আসছেন। হে-হে।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইলেন।

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতস্বরে বলিল, 'কে তিনি ?'

সুখময়বাবু বলিলেন, 'তাঁর নাম নফর কুণ্ডু। তাঁর কয়েক বস্তা চাল রেলে চালান যাচ্ছিল, একটা বস্তা ট্রেনের ঝাঁকানিতে ফেটে গিয়ে ভেতর থেকে দু'সের আফিম বেরিয়েছে। নফর কুণ্ডুও ধরা পড়েছেন। এই ট্রেনে তিনি আসছেন।' বলিয়া ভ্রূ নাচাইতে নাচাইতে স্টেশনমাস্টারের ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চৌকা-পাথর-ঢাকা প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'ওহে, বদ্রিদাস মাড়োয়ারীও এসেছেন।'

ব্যোমকেশ চকিতে চোখ তুলিল। মালগুদামের দিক হইতে বকের মত পা ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ বদ্রিদাস আসিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি আমাদের দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন না, ধীর মন্থর পদে প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশের ভ্রূ-কুঞ্চন আরও গভীর হইল।

মিনিটখানেক পরে আমি বলিলাম, 'ওহে, বিশুবাবুও উপস্থিত। কী ব্যাপার বলো দেখি ?'

যোধপুরী ব্রিচেস্ পরা বিশুবাবু ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেন, আমাদের দেখিতে পাইয়া স্মিতমুখে আগাইয়া আসিলেন।

'নমস্কার। কোথাও যাচ্ছেন ?'

'রামডিহি যাচ্ছি।'

'ওহো—সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি।'

'হ্যাঁ। দশটার মধ্যেই ফিরব। আপনি ?'

'একটা চালান আসবার কথা আছে, তারই খোঁজ নিতে এসেছি। দেখি যদি এসে থাকে।' অস্থিসার মুখে একটু হাসিয়া তিনি মাল-অফিসের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিয়াছিল। অবিলম্বে প্যাসেঞ্জার গাড়ি আসিয়া পড়িল। গাড়িতে উঠিবার আগে লক্ষ্য করিলাম, একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পুলিস-পরিবৃত একটি মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি অবতরণ করিলেন। অনুমান করিলাম ইনি আফিম-বিলাসী নফর কুণ্ডু। মনে পাপ ছিল বলিয়াই বোধহয় বেনামী চিঠি পাইয়া গা-ঢাকা দিয়াছিলেন।

দুই তিন মিনিট পরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে সংশয়ের ভ্রূকুটি গাঢ়তর হইয়াছে, যেন সে হঠাৎ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া মনস্থির করিতে পারিতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হল কি ? ঠেকায় পড়েছ মনে হচ্ছে।'

সে উত্তর দিবার আগেই ঘ্যাঁচ করিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলাম ডিস্টাণ্ট সিগনাল না পাইয়া গাড়ি থামিয়াছে। তারের বেড়ার ওপারে বাঘমারি গ্রাম দেখা যাইতেছে।

যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়াছে এমনিভাবে লাফাইয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ভালোই হল। অজিত, আমি এখানে নেমে যাচ্ছি, তুমি একাই রামডিহি যাও। প্রাণকেষ্টবাবুকে সব কথা জিগ্যেস করবে। সদানন্দবাবু তাঁর কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন কিনা এ-কথাটা জানতে ভুলো না।—আচ্ছা।'

গাড়ি সিটি মারিয়া আবার গুটিগুটি চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ব্যোমকেশ নামিয়া পড়িল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলাম। সে তারের বেড়া পার হইয়া আমার উদ্দেশে একবার হাত নাড়িল, তারপর বাঘমারি গ্রামের দিকে চলিল।

ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ কখনও আমাকে এমনভাবে ফেলিয়া পালায় নাই। মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। প্রাণকেষ্টবাবুকে কী জেরা করিব ? ব্যোমকেশ যখন জেরা করে তখন তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু নিজে এ-কাজ কখনও করি নাই। শেষে কি ধাষ্টামো করিয়া বসিব ! ব্যোমকেশ আমাকে একি আতান্তরে ফেলিয়া গেল !

প্যাসেঞ্জার গাড়ি দুল্‌কি চালে চলিয়াছে ; দু'তিন মাইল অন্তর ছোট ছোট স্টেশন, তবু অবিলম্বে গাড়ি রামডিহি পৌঁছিবে। সুতরাং এইবেলা মাথা ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিয়া লওয়া দরকার। প্রথমেই ভাবিতে হইবে, প্রাণকেষ্টবাবুকে ব্যোমকেশ জেরা করিতে চায় কেন ? প্রাণকেষ্টবাবু সদানন্দ সুরের ভগিনীপতি, সম্ভবত প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী, কারণ সদানন্দবাবুর নিকট আত্মীয় আর কেহ নাই।...সদানন্দবাবু কলিকাতা যাইবার পথে কি ভগিনীপতির কাছে লোহার তোরঙ্গ রাখিয়া গিয়াছিলেন ? তোরঙ্গে কি কোনও মহামূল্য দ্রব্য ছিল ? প্রাণকেষ্টবাবু কর্মসূত্রে এই পথ দিয়া ট্রলি চড়িয়া যাতায়াত করিতেন ; তাঁহার পক্ষে ট্রলি হইতে নামিয়া বাঘমারি গ্রামে উপস্থিত হওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে কি ব্যোমকেশের সন্দেহ প্রাণকেষ্টবাবুই শ্যালককে সংহার করিয়াছেন ?...

রামডিহি জংশনে পৌঁছিয়া প্রাণকেষ্ট পালের ঠিকানা পাইতে বিলম্ব হইল না। স্টেশনের সন্নিকটে তারের বেড়া দিয়া ঘেরা কয়েকটি ছোট ছোট কুঠি, তাহারই একটাতে প্রাণকেষ্টবাবু বাস করেন। কুঠির সামনে ছোট্ট বাগান ; প্যাণ্টুলুন ও হাত-কাটা গেঞ্জি পরা একটি পুষ্টকায় ব্যক্তি হাতে খুরপি লইয়া বাগানের পরিচর্যা করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া ফ্যালফ্যাল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনিই কি প্রাণকেষ্ট পাল ?'

তাঁহার হাত হইতে খুরপি পড়িয়া গেল। তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া বিহ্বলভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন। বলিলাম, 'আমি পুলিসের পক্ষ থেকে আসছি। খবর পেয়েছেন বোধহয় আপনার শালা সদানন্দ সুর মারা গেছেন।'

এই প্রশ্নে ভদ্রলোক এমন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে, মনে হইল তাঁহার প্যাণ্টুলুন এখনি খসিয়া পড়িবে। তারপর তিনি চমকিয়া উঠিয়া 'সুশীলা ! সুশীলা !' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

আমিও কম স্তম্ভিত হই নাই। মনে-মনে যাহাকে দুর্দান্ত শ্যালক-হন্তা বলিয়া আঁচ করিয়াছি, তাঁহার এইরূপ আচার-আচরণ ! পুলিসের নাম শুনিয়াই শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়িলেন ! কিংবা—এটা একটা ভান মাত্র। ঘাগী অপরাধীরা পুলিসের চোখে ধূলা দিবার জন্য নানাপ্রকার ছলচাতুরি অবলম্বন করে—প্রাণকেষ্টবাবু কি তাহাই করিতেছেন ? সুশীলাই বা কে ? তাঁহার স্ত্রী ?

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল, বাড়ির ভিতর হইতে সাড়াশব্দ নাই। অতঃপর কি করিব, ডাকাডাকি করিব কি ফিরিয়া যাইব, এইসব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারের কাছে প্রাণকেষ্টবাবুকে দেখা গেল। তিনি যেন কতকটা ধাতস্থ হইয়াছেন, প্যাণ্টুলুন যথাস্থানে আছে বটে, কিন্তু হাত-কাটা গেঞ্জির উপর বুশ-কোট চড়াইয়াছেন। মুখে মুমূর্ষ হাসি আনিয়া বলিলেন, 'আসুন।'

সামনের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি ছোট, কয়েকটি সস্তা বেতের চেয়ার ও টেবিল দিয়া সাজানো, অন্দরে যাইবার দরজায় পর্দা ; বিলিতি অনুকৃতির মধ্যেও একটু

পরিচ্ছন্নতা আছে। আমি অন্দরে যাইবার দরজার দিকে পিছন করিয়া বসিলাম, প্রাণকেষ্টবাবু আমার মুখোমুখি বসিলেন।

শুরু করিলাম, 'আপনার শালা সদানন্দবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছেন তাহলে ?'

প্রাণকেষ্ট চমকিয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'কখন খবর পেলেন ?'

'অ্যাঁ—সকালবেলা।'

'কার মুখে খবর পেলেন ?'

'অ্যাঁ—সান্তালগোলা থেকে হরিবিলাসবাবু টেলিফোন করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, আপনার স্ত্রী, মানে সদানন্দবাবুর ভগ্নী কি এখানে আছেন ?'

দেখিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দু'টি আমার মুখ ছাড়িয়া আমার পিছন দিকে চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ—আছেন।'

আমি পিছনে ঘাড় ফিরাইলাম। অন্দরের পর্দা একটু ফাঁক হইয়া ছিল, চকিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। বুঝিতে বাকি রহিল না, পর্দার আড়ালে আছেন পত্নী সুশীলা এবং নেপথ্য হইতে প্রাণকেষ্টবাবুকে পরিচালিত করিতেছেন।

'আপনার স্ত্রী নিশ্চয় খুব শোক পেয়েছেন ?'

আবার প্রাণকেষ্টবাবুর চকিতচক্ষু পিছন দিকে গিয়া ফিরিয়া আসিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, খুব শোক পেয়েছেন।'

'আপনার স্ত্রী সদানন্দবাবুর উত্তরাধিকারিণী ?'

'তা—তা তো জানি না। মানে—'

'সদানন্দবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সদ্ভাব ছিল।'

'যাওয়া-আসা ছিল ?'

'তা ছিল বৈকি। মানে—'

তাঁহার চক্ষু আবার পর্দার পানে ধাবিত হইল, 'অ্যাঁ—মানে—বেশি যাওয়া-আসা ছিল না। কালেভদ্রে—'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে ?'

'শেষ ? অ্যাঁ—ঠিক মনে পড়ছে না—'

'দশ-বারো দিন আগে তিনি আপনার বাসায় আসেননি ?'

প্রাণকেষ্টবাবুর চক্ষু দু'টি ভয়ার্ত হইয়া উঠিল, 'কৈ না তো !'

'তিনি কলকাতা যাবার আগে আপনার কাছে একটা স্টীলের ট্রাঙ্ক রেখে যাননি ?'

প্রাণকেষ্টবাবুর দেহ কাঁপিয়া উঠিল, 'না, না, স্টীলের ট্রাঙ্ক—না না, কৈ আমি তো কিছু—'

আমি কড়া সুরে বলিলাম, 'আপনি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছেন কেন ?'

'নার্ভাস ! না না—'

পর্দা সরাইয়া প্রাণকেষ্টবাবুর স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। স্বামীর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'আমার স্বামী নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ, অচেনা লোক দেখলে আরও নার্ভাস হয়ে পড়েন। আপনি কি জানতে চান আমাকে বলুন।'

মহিলাকে দেখিলাম। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, দৃঢ়গঠিত দেহ, চোয়ালের হাড় মজবুত, চোখের দৃষ্টি প্রখর। মুখমণ্ডলে ভ্রাতৃশোকের কোনও চিহ্নই নাই। তিনি যে অতি জবরদস্ত

মহিলা তাহা বুঝিতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। আমি উঠিয়া পড়িলাম, 'আমার যা জানবার ছিল জেনেছি, আর কিছু জানবার নেই। নমস্কার।' শ্রীমতী সুশীলাকে জেরা করা আমার কর্ম নয়।

স্টেশনে গিয়া জানিতে পারিলাম, ন'টার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টা কাটাইবার জন্য স্টেশনের স্টলে চা খাইলাম, অসংখ্য সিগারেট পোড়াইয়া প্ল্যাটফর্মে পাদচারণ করিলাম, এবং সস্ত্রীক প্রাণকেষ্টবাবুর কথা চিন্তা করিলাম।

প্রাণকেষ্ট পাল নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ হইতে পারেন ; কিন্তু তিনি যে আমাকে দেখিয়া এত বেশি নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা কেবল ধাতুগত স্নায়বিক দুর্বলতা নয়, অন্য কারণও আছে। কী সে কারণ ? প্রাণকেষ্ট পত্নীর ইশারায় আমার কাছে অনেকগুলা মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। কী সে মিথ্যাকথা ? সদানন্দ সুরের সহিত বেশি সম্প্রীতি না থাক, সদানন্দ সুর তাঁহার বাড়িতে যাতায়াত করিতেন। দশ-বারো দিন আগে কলিকাতায় যাইবার মুখে তিনি স্টীলের ট্রাঙ্কটি নিশ্চয় ভগিনীপতির গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ট্রাঙ্কে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান দ্রব্য ছিল। কী মূল্যবান দ্রব্য ছিল ? টাকাকড়ি ? গহনা ? বোমাবারুদ ? আন্দাজ করা শক্ত। কিন্তু শ্রীমতী সুশীলা বাক্সে কী আছে জানিবার কৌতূহল সংবরণ করিতে পারেন নাই, হয়তো তালা ভাঙিয়াছিলেন। তাঁহার মত জবরদস্ত মহিলার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু তারপর ? তারপর হয়তো ট্রাঙ্কে এমন কিছু পাওয়া গেল যে সদানন্দ সুরকে খুন করা প্রয়োজন হইল। হয়তো ট্রাঙ্কে হ্যান্ড-গ্রিনেড ছিল, সেই হ্যান্ড-গ্রিনেড দিয়াই সদানন্দকে—

কিন্তু না। শ্রীমতী সুশীলা যত দুর্ধর্ষ মহিলাই হোন, নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে খুন করিবেন ? আর প্রাণকেষ্ট পালের পক্ষে এরূপ দুঃসাহসিক কার্যে লিপ্ত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।...কিন্তু স্টেশনমাস্টার হরিবিলাসবাবু বন্ধুকে অশুভ সংবাদটা সাত-তাড়াতাড়ি দিতে গেলেন কেন ? বন্ধুসুলভ সহানুভূতি ?...

সাড়ে ন'টার সময় সান্তালগোলায় ফিরিলাম। আকাশে চাঁদ আছে, শহর-বাজার নিষুতি হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম বিশ্রান্তিগৃহে আসিয়া দেখিব ব্যোমকেশ ফিরিয়াছে। কিন্তু তাহার দেখা নাই। কোথায় গেল সে ?

বিশ্রান্তিগৃহের চাকরটা রন্ধন শেষ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ঢুলিতেছিল, তাহাকে খাবার ঢাকা দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। সে চলিয়া গেল।

কেরোসিনের বাতি কমাইয়া দিয়া বিছানায় অঙ্গ প্রসারিত করিলাম। পিছনের জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে।...কোথায় গেল ব্যোমকেশ ? বলা নাই কহা নাই ট্রেন হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। বাঘামারি গ্রামে তার কী কাজ ? এতক্ষণ সেখানে কী করিতেছে ?

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম ; ঘুম ভাঙিল কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিসফিস গলার শব্দে, 'অজিত, ওঠো, একটা জিনিস দেখবে এস।'

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, 'কী— ?'

'চুপ ! আস্তে !' ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া আমাকে বিছানা হইতে নামাইল, তারপর পিছনের জানালার দিকে টানিয়া লইয়া গেল ; বাহিরের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, 'দেখছ ?'

ঘুমের ঘোর তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইয়াছিল না জানি কী দেখিব ! কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে বোকার মত চাহিয়া রহিলাম। জানালা হইতে পনেরো-কুড়ি হাত দূরে ঝোপঝাড় আগাছার মাঝখানে খানিকটা মুক্ত স্থান,

সেইখানে ছয়-সাতটা কৃষ্ণবর্ণ জন্তু অর্ধবৃত্তাকারে বসিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। প্রথম দর্শনে মনে হইল কৃষ্ণকায় কয়েকটা কুকুর। বলিলাম, 'কালো কুকুর।' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহারা সমস্বরে হুক্কা-হুয়া করিয়া উঠিল, তখন আর সংশয় রহিল না। স্থানীয় শৃগালের দল চন্দ্রালোকে সঙ্গীত-সভা আহ্বান করিয়াছে।

আমার মুখের ভাব দেখিয়া ব্যোমকেশ হো-হো শব্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। শৃগালের দল চমকিয়া পলায়ন করিল। আমি বলিলাম, 'এর মানে? দুপুর রাত্রে আমাকে শেয়াল দেখাবার কী দরকার ছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আগে কখনও চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখেছ?'

'চাঁদের আলোয় শেয়াল দেখলে কী হয়?'

'পুণ্য হয়, অজ্ঞানতিমির নাশ হয়! আমার মনে যেটুকু সংশয় ছিল তা এবার দূর হয়েছে। চলো এখন খাওয়া যাক, পেট চুঁই-চুঁই করছে।'

আলো বাড়াইয়া দিয়া টেবিলে খাইতে বসিলাম। লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশ ক্ষুধার্তভাবে অন্নগ্রাস মুখে পুরিতেছে বটে, কিন্তু তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত ফুর্তি কিসের? দুপুর রাত পর্যন্ত ছিলে কোথায়? বাঘমারিতে?'

সে বলিল, 'বাঘমারির কাজ ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপর—'

'বাঘমারিতে কী কাজ ছিল?'

'পটল, দাশু আর গোপালের সঙ্গে কাজ ছিল।'

'হুঁ, কী কাজ ছিল বলবে না। যাক, তারপর?'

'তারপর সান্তালগোলায় ফিরে এসে সুখময় দারোগার কাছে গেলাম। সেখানে একঘণ্টা কাটিল। তারপর গেলাম স্টেশনে। হরিবিলাসবাবু ছিলেন না, তাঁকে বিছানা থেকে ধরে নিয়ে এলাম। লম্বা টেলিফোন করতে হল। এখানকার থানায় পাঁচটি বৈ লোক নেই। কাল সকালে বাইরে থেকে দশজন আসবে। সব ব্যবস্থা করে ফিরে এলাম।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'প্রাণকেষ্ট পালের কথা জানবার দরকার নেই তাহলে?'

'আছে বৈকি। কি হল সেখানে?'

সব কথা মাছিমারা ভাবে বয়ান করিলাম। সে মন দিয়া শুনিল, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না। আহারান্তে মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল, 'জোড়ার একটা যদি হয় গবেট, অন্যটা হয় বিচ্ছু। প্রকৃতির এই বিধান।'

অতঃপর সিগারেট ধরানো হইলে বলিলাম, 'তোমার পকেটে ওটা কি?'

ব্যোমকেশ একটু চকিত হইল, একটু লজ্জিত হইল। বলিল, 'বন্দুক—মানে, পিস্তল।'

'কোথায় পেলে?'

'থানায়। সুখময় দারোগার পিস্তল।'

'হুঁ। কোনও কথাই পষ্ট করে বলতে চাও না। বেশ, তাহলে এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'তুমি শুয়ে পড়, আমাকে রাতটা জেগেই কাটাতে হবে।'

'কেন?'

'যাঁর হাতে হ্যান্ড-গ্রিনেড আছে তিনি যদি ভয় পেয়ে থাকেন তাহলে সাবধান থাকা ভালো।'

'তবে আমিও জেগে থাকি।'

রাত্রিটা জাগিয়া কাটিল। সুখের বিষয় কোনও উৎপাত হয় নাই। শেষরাত্রে চা পান

করিতে করিতে ব্যোমকেশ মুখের বন্ধন একটু আলগা করিল, আমাদের অচিন পাখির নাম জানিতে পারিলাম।

দশ

সকাল সাতটার সময় দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ গায়ে একটা উড়ানিচাদর জড়াইয়া লইল, যাহাতে পকেটের পিস্তলটা দৃষ্টি আকর্ষণ না করে।

গঞ্জ-গোলার কর্মতৎপরতা এখনও পুরাদমে আরম্ভ হয় নাই, দুই-চারিটা গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার ট্রাক চলিতে শুরু করিয়াছে। আমরা বদ্রিদাস মাড়োয়ারীর মিল-এ প্রবেশ করিলাম।

বদ্রিদাস দাওয়ায় উবু হইয়া বসিয়া দাঁতন করিতেছিলেন, পাশে জলভরা ঘটি। আমাদের প্রথমটা দেখিতে পান নাই, একেবারে কাছে পৌঁছিলে দেখিতে পাইয়া তাঁহার চক্ষু দু'টি খাঁচার পাখির মত ঝট্‌পট করিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল, হাত হইতে দাঁতন পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেঠজি, আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

বদ্রিদাস উবু অবস্থা হইতে অর্ধোত্থিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, 'ক্যা—ক্যা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা এক জায়গায় খানাতল্লাশ করতে যাচ্ছি, আপনি এখানকার গণ্যমান্য লোক, আপনাকে সাক্ষী মানতে চাই।'

'নেহি, নেহি'—বলিতে বলিতে তিনি জলভরা ঘটিটা তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বিশেষ একটি স্থানের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার বাহির হইলাম। বিশ্বনাথ মল্লিকের মিল-এ পৌঁছিতে পাঁচ মিনিট লাগিল। ফটকের কাছে নায়েব-সরকার নীলকণ্ঠ অধিকারীর সঙ্গে দেখা হইল। নীলকণ্ঠ ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, 'এত সকালে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কর্তা কোথায়?'

'নিজের ঘরে আছেন। চা খাচ্ছেন।'

'চলুন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'আসুন।'

বিশ্বনাথ মল্লিক নিজের ঘরে টেবিলে বসিয়া পাউরুটি, মাখন ও অর্ধসিদ্ধ ডিম্ব সহযোগে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া তাঁহার চোয়ালের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল। গলা হইতে অস্বাভাবিক স্বর নির্গত হইল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সকালবেলাই আসতে হল। কিন্তু তাড়া নেই, আপনি খাওয়া শেষ করে নিন।'

বিশুবাবু ডিমের প্লেট সরাইয়া দিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন, 'কি দরকার?' দেখিলাম তাঁহার অস্থিসার মুখখানা ধীরে ধীরে বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'কাল ভেবেছিলাম আপনার মিল খানাতল্লাশ করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে লাভ থাকতেও পারে।'

বিশুবাবুর রগের শিরা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, মনে হইল তিনি বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িবেন। কিন্তু তিনি অতি যত্নে নিজেকে সংবরণ করিলেন, তাঁহার ঠোঁটে হাসির মত একটা ভঙ্গিমা দেখা দিল। তিনি বলিলেন, 'হঠাৎ মত বদলে ফেললেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কারণ ঘটেছে। কাল বিকেলে আমি রামডিহি যাইনি, আপনাদের ওই

জঙ্গলে শিমুলগাছের কাছে লুকিয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে গাঁয়ের তিনটি ছেলে ছিল। আমরা কাল রাত্রে যা দেখেছি তার ফলে মত বদলাতে হয়েছে, বিশ্বনাথবাবু।'

বিশ্বনাথবাবুর চোখদু'টা একবার জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া গেল। তিনি কম্পিতহস্তে একটা সিগারেট ধরাইলেন, অলসভাবে বুক-পকেট হইতে একটা চাবির রিঙ বাহির করিয়া আঙুলে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, 'আমি যদি আমার মিল খানাতল্লাশ করতে না দিই ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ইচ্ছের ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। আমি তল্লাশী পরোয়ানা এনেছি।'

'কৈ, দেখি পরোয়ানা।'

ব্যোমকেশ পকেটে হাত দিল, বিশুবাবু বিদ্যুৎবেগে চাবি দিয়া দেরাজ খুলিবার উপক্রম করিলেন। ব্যোমকেশ পকেট হইতে হাত বাহির করিল, হাতে পিস্তল। সে বলিল, 'দেরাজ খুলবেন না।'

কোণ-ঠাসা বনবিড়ালের মত বিশু মল্লিক ঘাড় ফিরাইলেন ; ব্যোমকেশের হাতে পিস্তল দেখিয়া তিনি দেরাজ খোলার চেষ্টা ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া শীৎকারের মত একটা তর্জন-শ্বাস বাহির হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, বাঁশী বাজাও।'

পুলিসের বাঁশী পকেটে লইয়া আমি প্রস্তুত ছিলাম, এখন সবেগে তাহাতে ফুৎকার দিলাম।

মিনিটখানেকের মধ্যে দারোগা সুখময় সামন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গে ঘর ভরিয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ইন্সপেক্টর সামন্ত, বিশ্বনাথ মল্লিককে অ্যারেস্ট করুন, হাতে হাতকড়া পরান। ওঁর হাতে চাবি আছে, চাবি দিয়ে দেরাজ খুলুন। সাবধানে খুলবেন, অস্ত্রগুলো দেরাজের মধ্যেই আছে।'

বিশ্বনাথ মল্লিককে সহজে গ্রেপ্তার করা গেল না, তিনি বনবিড়ালের মতই আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া লড়াই করিলেন। অবশেষে পাঁচ-ছয় জন মিলিয়া তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া হাতে হাতকড়া পরাইল। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিয়া দেখা গেল তাহাতে ছাব্বিশটি ·৩৮ অটোম্যাটিক, অসংখ্য কার্তুজ এবং চৌদ্দটি হ্যান্ড-গ্রিনেড আছে। কালাবাজারে এগুলির দাম অন্তত বিশ হাজার টাকা।

বিশ্বনাথ মল্লিক পুলিস পরিবৃত হইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতেছিলেন, হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বেশ, আমি চোরা-হাতিয়ারের কারবার করি। কিন্তু অমৃতকে আর সদানন্দ সুরকে খুন করেছি তার কোনো প্রমাণ আছে ?'

ব্যোমকেশ শান্তকণ্ঠে বলিল, 'প্রমাণ আছে কিনা সে-বিচার আদালত করবেন। কিন্তু মোটিভ যথেষ্ট ছিল। আর আপনি যে-পিস্তল দিয়ে অমৃতকে মেরেছিলেন সে-পিস্তলটা এর মধ্যেই আছে। গুলিটা অমৃতের শরীরের মধ্যে পাওয়া গেছে। Ballistic পরীক্ষায় সেটা প্রমাণ করা শক্ত হবে না।'

বিশ্বনাথ মল্লিকের চোখদু'টা ঘোলা হইয়া গেল, তিনি হাতকড়াসুদ্ধ দুই হাত দিয়া নিজের কপালে সজোরে আঘাত করিয়া এলাইয়া পড়িলেন।

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে মধ্যাহ্ন-ভোজন সম্পন্ন করিয়া আমরা বিশ্রান্তিগৃহের দুইটি খাটে লম্বমান হইয়াছিলাম। পটল, দাশু ও গোপাল বারংবার ব্যোমকেশের পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। দারোগা সুখময় সামন্ত আসামীকে সদরে চালান দিয়া স্তূপীকৃত হাঁসের ডিমের বড়া খাইতে খাইতে থানার অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, আসামীর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তাঁহার কৃতিত্বও কম নয়। গঞ্জের কর্মতৎপরতা ক্ষণকালের জন্য মন্দীভূত হইলেও আবার পুরাদমে চালু হইয়াছে : রামে রাম দুয়ে দুই। অমৃত এবং সদানন্দ সুর নামক দুটি অখ্যাত ব্যক্তির অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জীবনের নিত্যস্রোত ব্যাহত হয় নাই। এবং তাহাদের আততায়ী ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলেও ব্যাহত হইবে না। রামে রাম দুয়ে দুই। ...রাম নাম সত্য হ্যায়। ...

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বদিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল ; বলিল, 'সদানন্দ সুরের মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু অমৃত ছেলেটা নেহাত অকারণেই মারা গেল।'

আমি একটা নূতন সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'গোড়া থেকে বলো।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ কাহিনীর গোড়া হচ্ছেন সদানন্দ সুর। তিনি না থাকলে আমরা চোরাকারবারী আসামীকে ধরতে পারতাম না। তাঁকে দিয়েই কাহিনী শুরু করা যেতে পারে।

সদানন্দ সুরের চরিত্র যতটুকু বুঝেছি, তিনি ছিলেন কৃপণ এবং সংবৃতমন্ত্র। নিজের হাঁড়ির খবর কাউকে দিতে ভালবাসতেন না। অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সাধারণ। বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু নিজে বিয়ে করেননি। পৈতৃক ভিটে এবং দু'চার বিঘে জমি ; সান্তালগোলার বাজারে দু'চার মণ ধান-চালের দালালি ; কবিরাজী ওষুধ বিক্রি করে দু'চার পয়সা লাভ ;—এই ছিল তাঁর অবলম্বন। একলা মানুষ, তাই কোনও রকমে চলে যেত।

কিন্তু তাঁর মনে ভোগতৃষ্ণা ছিল। কৃপণেরা গাঁটের পয়সা খরচা করে ভোগতৃষ্ণা মেটাতে চায় না বটে, তাই বলে তাদের ভোগতৃষ্ণা নেই এ-কথা কেউ বলবে না। সদানন্দবাবুর সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না। হয়তো তিনি তাঁর ক্ষুদ্র রোজগার থেকে দু'চার পয়সা বাঁচাতেন, কিন্তু তা নিয়ে ফুর্তি করার মত চরিত্র তাঁর নয়। এইভাবে জীবন কাটছিল। বয়স বাড়ছে, শক্তি-সামর্থ্য ফুরিয়ে আসছে। হয়তো এমনি বুভুক্ষু অবস্থাতেই তাঁর জীবন শেষ হত। হঠাৎ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা মস্ত সুযোগ জুটে গেল।

বিশ্বনাথ মল্লিকের কাছে সদানন্দবাবুর যাতায়াত ছিল। বিশ্বনাথ মল্লিকের দেরাজে কবিরাজী মোদকের শিশি পাওয়া গেছে, নিশ্চয় সদানন্দবাবু যোগান দিতেন। এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা। তারপর হঠাৎ একদিন সদানন্দবাবু বিশু মল্লিকের জীবনের গোপনতম কথাটি জানতে পারলেন। বিশু মল্লিক চোরা-অস্ত্রশস্ত্রের কারবারী। কি করে জানতে পারলেন বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন কোথায় বিশু মল্লিক তার অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখে। শিমুলগাছটা তাঁর বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়, হয়তো হঠাৎ বিশু মল্লিককে সেখানে দেখে ফেলেছিলেন।

সদানন্দবাবু গুপ্তস্থান থেকে বোমা-বন্দুক চুরি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সে-পথ দিয়ে গেলেন না। বোমা-বন্দুক কি করে কালাবাজারে চালাতে হয়, পাড়াগেঁয়ে মানুষ সদানন্দ সুর তা জানতেন না। তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। বিশু মল্লিককে বললেন, টাকা দাও, নইলে সব ফাঁস করে দেব। অর্থাৎ সোজাসুজি ব্ল্যাকমেল।

বিশু মল্লিক নিরুপায়। পাঁচশো টাকা বার করতে হল। সেই টাকা নিয়ে সদানন্দবাবু বাড়ি

ফিরে এলেন। ফুর্তির বয়স শেষ হয়ে আসছে, আর দেরি করা চলে না। তিনি স্থির করলেন কলকাতা যাবেন।

কিন্তু তিনি ভারি হিসেবী লোক, সব টাকা নিয়ে কলকাতা যাওয়া তাঁর মনোমত নয়। অথচ বাঘমারির শূন্যবাড়িতে টাকা রেখে গেলেও ভয় আছে, চোর এসে সর্বস্ব নিয়ে যেতে পারে। তিনি একটি কাজ করলেন।

আমি তোমাকে যে বলছি অধিকাংশই আন্দাজ, কিন্তু এলোমেলো আন্দাজ নয়। সদানন্দ সুর একটি স্টীলের ট্রাঙ্কে বেশির ভাগ টাকা রাখলেন, সঞ্চিত যা ছিল তা রাখলেন, হয়তো সাবেক কালের কিছু গয়নাগাঁটি ছিল তাও রাখলেন। তারপর একহাতে স্টীল-ট্রাঙ্ক এবং অন্যহাতে নিজের ব্যবহারের ক্যাম্বিস-ব্যাগ নিয়ে যাত্রা করলেন। রামডিহি স্টেশনে তাঁর বোন-ভগিনীপতি আছে, তাদের জিম্মায় ট্রাঙ্ক রেখে কলকাতায় যাবেন ফুর্তি করতে।

সদানন্দ সুর তো চলে গেলেন, এদিকে ফাঁপরে পড়েছে বিশু মল্লিক। এতদিন সে বেশ নিরুপদ্রবেই ব্যবসা চালাচ্ছিল, এখন দেখল সে বিষম ফাঁদে ধরা পড়েছে। সদানন্দ সুর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তার উদ্ধার নেই, সদানন্দ সুর তাকে শোষণ করবে। সে ঠিক করল সদানন্দ সুরকে সরাতে হবে ; তার মাথায় বুদ্ধি আছে, হাতে আছে মারাত্মক অস্ত্র। সদানন্দকে সরানো শক্ত কাজ নয়।

সদানন্দ ভগিনীপতির বাসায় তোরঙ্গ রেখে কলকাতায় গিয়ে বোধকরি ফুর্তিই করছেন, এদিকে বিশু মল্লিক একদিন সন্ধ্যের পর ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে ঢুকল, শিমুলগাছ থেকে একটি হ্যান্ড-গ্রিনেড নিয়ে সদানন্দর বাড়িতে বুবি-ট্র্যাপ পেতে এল। সদানন্দ কলকাতা থেকে যেই বাড়িতে ঢুকতে যাবেন অমনি বোমা ফাটবে।

কিন্তু সদানন্দ সুর কলকাতা থেকে ফিরে আসবার আগেই কিছু কিছু ব্যাপার ঘটতে আরম্ভ করেছিল। বিশু মল্লিকের যখনই অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রি করবার দরকার হত তখনই সে ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে যেত। একদিন রাত্রি দশটার সময় অমৃত বাছুর খুঁজতে এসে ঘোড়াটাকে দেখে ফেলল। সে ভাবল ঘোড়া-ভূত। তারপর যখন সে বন্ধুদের খোঁচায় আবার জঙ্গলে ঢুকল তখন শুধু ঘোড়া নয়, শিমুলতলায় ঘোড়ার সওয়ারের সঙ্গেও তার দেখা হয়ে গেল।

বিশু মল্লিক সেদিন বোধহয় সদানন্দ সুরের বুবি-ট্র্যাপ পেতে ফিরে যাচ্ছিল। দু'জনেই দু'জনকে চেনে ; অমৃত চাকরির জন্য বিশু মল্লিকের কাছে দরবার করছিল। বিশু মল্লিক দেখল, এর পর যখন বুবি-ট্র্যাপ ফাটবে তখন অমৃত সাক্ষী দেবে যে, সে বিশু মল্লিককে রাত্তিরে সদানন্দ সুরের বাড়ির পিছনে দেখেছে ; হয়তো বিশু মল্লিক যখন সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কে বেরুচ্ছিল তখন দেখেছে। অতএব অমৃতের বেঁচে থাকা নিরাপদ নয়। বিশু মল্লিকের কাছে অটোম্যাটিক পিস্তল ছিল, সে অমৃতকে খুন করে ঘোড়ার পিঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি যখন প্রথম অকুস্থলে এসে তদন্ত আরম্ভ করলাম তখন সবচেয়ে আশ্চর্য মনে হল—ঘোড়া। অমৃত ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমি দেখলাম জলজ্যান্ত ঘোড়ার খুরের দাগ। একটা ঘোড়া এই মামলার সঙ্গে জড়িত আছে। তখনও আমরা আসামীকে চিনি না, কিন্তু সে যেই হোক, ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে। কেন ?

ঘোড়ায় চড়ে শীগ্‌গির যাতায়াত করা যায়, কিন্তু আবার সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে-লোক দুষ্কার্য করতে বেরিয়েছে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ; তবে এ-ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে আসে কেন ? নিশ্চয় কোনও বিশেষ সুবিধে আছে। কী সুবিধে ? সদানন্দ সুরের পাঁচিল টপ্‌কানো ? ঘোড়ার পিঠ থেকে পাঁচিল টপ্‌কানোর সুবিধে হয়, ওদিকে

নামবার জন্যে পেয়ারাগাছ আছে। কিন্তু শুধু কি এই ? না, অন্য কিছুও আছে ? এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছিলাম কাল রাত্রে। কিন্তু সে পরের কথা।

যথাসময়ে সদানন্দ সুর ফিরে এলেন। তোরঙ্গটা তিনি ফিরিয়ে আনেননি, বোধহয় ইচ্ছে ছিল বাড়িতে দু'দিন বিশ্রাম করে ভগিনীপতির বাসা থেকে তোরঙ্গ নিয়ে আসবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হল না। নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রায় আমাদের চোখের সামনে তিনি মারা গেলেন।

সদানন্দ সুরের মৃত্যুর পর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। আমি যাকে ধরতে এসেছি সে-ই মেরেছে অমৃত আর সদানন্দ সুরকে। যারা আগ্নেয়াস্ত্র কেনে তারা বাইরের লোক, হত্যাকারী বাইরের লোক নয় ; অমৃত আর সদানন্দ সুরের চেনা লোক। অমৃত তাকে দেখে ফেলেছিল এবং সদানন্দ সুর তাকে দোহন করতে শুরু করেছিল। কেবল দুটো কথা তখনও অজ্ঞাত ছিল—লোকটা কে ? এবং কালো ঘোড়ায় চড়ে আসে কেন ?

অমৃত বলেছিল, কালো ঘোড়া-ভূত, নাক দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। সবটাই তার উত্তপ্ত কল্পনা হতে পারে। আবার খানিকটা সত্যি হতে পারে। সুতরাং কালো ঘোড়ার খোঁজ নেওয়া দরকার।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল সান্তালগোলায় কেবল একটি কালো ঘোড়া আছে, তার মালিক বদ্রিদাস মাড়োয়ারী। তবে কি বদ্রিদাস-ই আমার আসামী ? বদ্রিদাস লোকটি পাঁকাল মাছের মত পিছল ; তিনি ধান-চালে প্রচুর কাঁকর মেশাতে পারেন, স্বজাতির প্রতি তাঁর অসীম পক্ষপাত থাকতে পারে ; কিন্তু তিনি দু-দুটো মানুষকে খুন করতে পারেন এত সাহস নেই। তাছাড়া তাঁকে ঘোড়সওয়ার রূপে কল্পনা করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

আমি বেনামী চিঠি পাঠানোর ফলে একটা কাজ হয়েছিল, সন্দেহভাজনদের দল থেকে জনকতক লোককে বাদ দেওয়া গিয়েছিল। যমুনাদাস গঙ্গারাম বেনামী চিঠি পুলিসকে দেখিয়েছিল, সুতরাং সে নয়। নফর কুণ্ডুর ওপর প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল তার ঘোড়া নেই। পরের ঘোড়া ধার করে কেউ খুন করতে যায় না। প্রাণকেষ্ট পালকে অবশ্য আমি গোড়া থেকে বাদ দিয়েছিলাম। ট্রলিতে চড়ে বাঘমারি গ্রামের কাছাকাছি যাওয়া যায় বটে, কিন্তু ট্রলিতে কুলি থাকে, তাদের চোখ এড়িয়ে খুন করার সুবিধে নেই। আমার শুধু জানবার কৌতূহল ছিল, সদানন্দ সুরের ট্রাঙ্কে কী আছে।

যাহোক, সন্দেহভাজনের দলকে ছাঁটাই করে মাত্র তিনজন দাঁড়াল—বদ্রিদাস মাড়োয়ারী, বিশু মল্লিক আর সুখময় দারোগা। সুখময় দারোগাকে বাদ দিতে পারিনি ; তার একটা ঘোড়া আছে, যদিও সেটা কালো নয়। এবং তার পক্ষে এইজাতীয় কারবার চালানো যত সহজ এমন আর কারুর পক্ষে নয়। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার বেশি।

অবশ্যি যখন জানতে পারলাম বিশু মল্লিক একসময় জকি ছিল, তখন সব সন্দেহই তার ওপর গিয়ে পড়ল। উপরন্তু জানা গেল, বিশু মল্লিক সদানন্দ সুরকে পাঁচশো টাকা ধার দিয়েছে। আসলে ওটা ধার নয়—ঘুষ। সদানন্দ সুরের মত নিঃস্ব লোককে কোনও ব্যবসাদার শুধু-হাতে ধার দেবে না।

আমি বিশু মল্লিকের জন্যে টোপ ফেললাম, আমার মনের প্রাণের কথা সব তাকে বলে ফেললাম। জঙ্গলে যে অস্ত্রগুলো লুকিয়ে রাখা সম্ভব এ-চিন্তা আমার গোড়া থেকেই ছিল। আমি ভেবেছিলাম শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও মাটিতে পোঁতা আছে। বিশু মল্লিক যখন শুনল আমরা জঙ্গল খানাতল্লাশ করবার মতলব করেছি, তখন সে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। অস্ত্রগুলো অবশ্য খুবই যত্ন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; কিন্তু বলা যায় না, পুলিস খুঁজে বার

করতে পারে। তখন বিশু মল্লিককে অবশ্য ধরা যাবে না, কিন্তু অনেক টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। বিশু মল্লিক লোভে পড়ে গেল।

কাল বিকেলে আমি যখন রামডিহি যাবার জন্যে ট্রেনে চড়লাম তখন বিশু মল্লিক এসে দেখে গেল আমি সত্যি যাচ্ছি কিনা। আমার অবশ্য রামডিহি পর্যন্ত যাবার প্ল্যান ছিল না, স্থির করেছিলাম পরের স্টেশনে নেমে বাঘমারিতে ফিরে আসব। কিন্তু দৈব অনুকূল, ঠিক বাঘমারি গ্রামের গায়ে ট্রেন থেমে গেল।

গ্রামে গিয়ে পটল, দাশু আর গোপালকে যোগাড় করলাম ; তাদের নিয়ে জঙ্গলে গেলাম। সারা জঙ্গল তল্লাশ করা অসম্ভব ; কিন্তু সদানন্দ সুরের পাঁচিলের পাশে যেখানে ঘোড়ার খুরের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে শিমুলগাছের গোড়া পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম, যদি কোথাও সদ্য-খোঁড়া মাটি দেখতে পাই। কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না।

এখন কি করা যায়! সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। জঙ্গলে বসে সিগারেট টানতে টানতে মতলব ঠিক করে নিলাম। পটলদের বললাম, 'চলো, সান্তালগোলার দিকে যাওয়া যাক।'

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সান্তালগোলার কিনারায় পৌঁছলাম। এখানে জঙ্গল প্রায় দেড়শো গজ চওড়া ; একপ্রান্তে স্টেশন, অন্যপ্রান্তে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, মাঝামাঝি বিশু মল্লিকের মিল। মিল-এর এটা পিছন দিক, কাঁটা-তারের বেড়ায় ছোট খিড়কির ফটক আছে। আমি পটলদের আমার প্ল্যান বুঝিয়ে দিলাম। তারা জঙ্গলের কিনারায় সম-ব্যবধানে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকবে এবং লক্ষ্য করবে ঘোড়ায় চড়ে কিংবা পায়ে হেঁটে কেউ জঙ্গলে ঢোকে কিনা। লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করবে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ধরবার চেষ্টা করবে না।

পটল উঠল বিশু মল্লিকের মিল-এর সরাসরি একটা গাছে, দাশু গেল স্টেশনের দিকে, আর গোপাল ব্যাঙ্কের দিকে। আকাশে আজও চাঁদ আছে ; রাত হলেও, এদের চোখ এড়িয়ে কেউ জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না।

ওদের গাছে তুলে দিয়ে আমি ফিরে চললাম শিমুলগাছের কাছে। ওই গাছটা আমার মনে ঘোর সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল। অমৃতের মৃত্যু হয় ঐ গাছের তলায়। এ-রহস্যের চাবিকাঠি যদি জঙ্গলের মধ্যে থাকে তবে নিশ্চয় ঐ শিমুলগাছের কাছাকাছি কোথাও আছে।

যখন শিমুলতলায় ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে, চাঁদের আলো ফুটেছে। শিমুলগাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে একটা ঝাঁকড়া ঝোপের গাছ ছিল, আমি তাতে উঠে পড়লাম। এইখানে বসে বাঘ-শিকারীর মত অপেক্ষা করব। আমার সঙ্গে অস্ত্র নেই, আমি এসেছি শুধু ব্যাঘ্র-মশাইকে দেখতে। তিনি আসবেন কিনা জানি না, কিন্তু যদি আসেন, ন'টার আগেই আসবেন।

শিমুলগাছের সব পাতাই প্রায় ঝরে গেছে, গাছের তলায় ছায়া নেই। চাঁদ যত উঁচুতে উঠছে আলো তত পরিষ্কার হচ্ছে। হঠাৎ কাছের একটা গাছ থেকে কোকিল ডেকে উঠল। বিচিত্র পরিস্থিতি। আমি বসে আছি একটা নৃশংস নরহন্তাকে দেখব বলে, আর—কোকিল ডাকছে! আজব দুনিয়া!

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। চোখের কাছে হাত এনে ঘড়ি দেখলাম, পৌনে আটটা। সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে একটা আওয়াজ কানে এল, শুকনো পাতার ওপর পায়ের মচমচ শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, ঘন ছায়ার ভিতর থেকে ধীর-মন্থর গমনে একটা ঘোড়া বেরিয়ে আসছে। কালো ঘোড়া। তার পিঠে বসে আছে কালো-পোশাক পরা একটা মানুষ। মানুষটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে জকির মত সামনে ঝুঁকে বসেছে আর সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

ঘোড়াটা সোজা গিয়ে শিমুলগাছের বিরাট গুঁড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যা দেখলাম তা একেবারে সার্কাসের খেলা। ঘোড়ার সওয়ার টপ্ করে ঘোড়ার পিঠে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত বাড়িয়ে শিমুলগাছের গুঁড়িতে একটা ফোকরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে যেখানে ডালপালা বেরিয়েছে সেখানে একটা খোপের মত ফুটো আছে। অচিন পাখির বাসা!

ঘোড়ার পিঠে আসামী কেন জঙ্গলে আসে এখন বুঝতে পারছ? অস্ত্রগুলো মাটিতে পোঁতা নেই, আছে গাছের ফোকরের মধ্যে, মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে। শিমুলগাছের গায়ে শক্ত-শক্ত মোটা মোটা কাঁটা থাকে; শিমুলগাছে মানুষ ওঠে না, এমন কি কাঠবেরালি পর্যন্ত ওঠে না। এমন নিরাপদ গুপ্তস্থান আর নেই। অবশ্য মই লাগিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু কে মই লাগাবে? আর যিনি জানেন তিনি যদি মই ঘাড়ে করে জঙ্গলে আসেন তাহলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তার চেয়ে ঘোড়া ঢের নিরাপদ; বিশেষত যদি জকির হাতের শিক্ষিত ঘোড়া হয়।

যাহোক, ঘোড়সওয়ারের বাঁ হাতে একটা থলি আছে; সে খোপের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে একটি একটি করে অস্ত্রগুলি বার করছে আর থলিতে রাখছে। এতক্ষণে ঘোড়সওয়ারকে চিনতে পেরেছি—বিশু মল্লিক। মুখ চিনতে না পারলেও, ঐ রোগা বেঁটে শরীর আর ধনুকের মত বাঁকা ঠ্যাং ভুল হবার নয়। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু একটা ধোঁকা তখনও কাটেনি; বিশু মল্লিক কালো ঘোড়া পেল কোত্থেকে? সে ভারি হুঁশিয়ার লোক, তার যদি কালো ঘোড়া থাকত সে কখনই আমার কাছে মিথ্যেকথা বলত না। আসলে আমি যখন তাকে কালো ঘোড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম তখন সে আমার প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এ-মামলার সঙ্গে কালো ঘোড়ার যে কোনও সম্বন্ধ আছে তা সে কল্পনা করতেই পারেনি। আমি কালো ঘোড়ার রহস্য বুঝলাম কাল দুপুর-রাত্রে, বাসায় ফিরে এসে।

সে যাক, বিশু মল্লিক থলি ভরে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে নেমে বসল, তারপর মন্দমন্থর চালে ফিরে চলল। সে জঙ্গলের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আমি গাছ থেকে থেকে নামলাম। ঘড়িতে তখন সওয়া আটটা। আমি আবার পটলদের উদ্দেশে ফিরে চললাম। আমার প্ল্যান ঠিকই ফলেছে; পুলিস কাল জঙ্গল তল্লাশ করবে, তাই আজ বিশু মল্লিক অস্ত্রগুলো জঙ্গল থেকে সরিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অস্ত্রগুলোকে সে রাখবে কোথায়? কারণ, কেবল মানুষটাকে ধরলে চলবে না, অস্ত্রগুলোও চাই। বস্তুত, অস্ত্রগুলো না পেলে মানুষটাকে ধরে কোনও লাভ নেই।

আমি যখন জঙ্গলের কিনারায় পৌঁছলাম তখনও পটলেরা গাছ থেকে নামেনি, আমাকে দেখে নেমে এল। তিনজনেই ভীষণ উত্তেজিত; তারা ঘোড়সওয়ারকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখেছে এবং চিনতে পেরেছে। বিশু মল্লিক তার রাইস্ মিল-এর খিড়কি-ফটক দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে এল, পটলের গাছের প্রায় পাশ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকল। চল্লিশ মিনিট পরে আবার ফিরে ফটক দিয়ে মিল-এ চলে গেল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ঠিক দেখেছ নিজের ফটকে ঢুকেছে? অন্য কোথাও যায়নি?'

পটল বলল, 'আজ্ঞে না, অন্য কোথাও যায়নি।'

আমি নিশ্চিন্ত হলাম। অস্ত্রগুলো বিশু মল্লিক মিলেই রাখবে, অন্তত যতদিন না পুলিস জঙ্গল-তল্লাশ শেষ করে। আমি সকালবেলা তাকে বলেছিলাম মিল খানাতল্লাশ করব না, আমার কথায় সে বিশ্বাস করেছে। আমাকে বিশু মল্লিক বোধ হয় খুবই সরলপ্রকৃতির লোক বলে মনে করেছিল।

আমি তখন পটল, দাশু আর গোপালের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললাম, 'তোমাদের জন্যে অমৃতের মৃত্যুর কিনারা করতে পারলাম। কিন্তু আজ আর বেশি কৌতূহল প্রকাশ কোরো না ; কাল সকাল ন'টার সময় এসো, তখন সব জানতে পারবে। কিন্তু সাবধান, কাউকে একটি কথা বলবে না।'

তারা গ্রামে ফিরে গেল। আমি থানায় গেলাম। সুখময় দারোগার কাছে পিস্তলটা যোগাড় করে স্টেশনে গেলাম। স্টেশন থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ফিরে এলাম তখন রাত দুপুর, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ।

তোমাকে জাগালাম না, পিছনের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, জানালার বাইরে কয়েকটা জন্তু বসে আছে। প্রথমটা আমিও ভেবেছিলাম কালো কুকুর, তারপর লক্ষ্য করে দেখলাম, কুকুর নয়—শেয়াল। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে কালো ঘোড়ার রহস্য ভেদ হয়ে গেল। বুঝতে পারলে না ? অত্যন্ত সহজ, এমন কি, হাস্যকর। কেন যে কথাটা মাথায় আসেনি জানি না।—শেয়ালের গায়ের রঙ কালো নয়, পাটকিলে। অথচ আমরা দেখলাম কালো। ঘোড়াটাও কালো ছিল না, ছিল গাঢ় বাদামী রঙের ; ইংরেজিতে যাকে বলে চেস্টনাট। চাঁদের আলোয় সব গাঢ় রঙই দূর থেকে কালো দেখায়। তাই অমৃত কালো ঘোড়া-ভূত দেখেছিল, আমিও কালো ঘোড়া দেখেছিলাম। এই হল কালো ঘোড়ার রহস্য। রহস্য না বলে যদি পরিহাস বলতে চাও তাতেও আপত্তি নেই।

রাত্রে খেতে বসে তুমি সস্ত্রীক প্রাণকেষ্ট পালের উপাখ্যান বললে। ওদের গলদ কোথায় বুঝতে বেশি কষ্ট হয় না। প্রাণকেষ্ট পাল নিজের কাজে বেশ দক্ষ, কিন্তু ঘরে জারিজুরি চলে না, স্ত্রীর কাছে কেঁচো। সদানন্দ সুর বোনের কাছে তোরঙ্গ রেখে গিয়েছিলেন ঠিকই। তোরঙ্গ গোড়ায় ভাঙ্গা হয়নি ; কিন্তু যখন তাঁর মৃত্যু-সংবাদ এল, তখন ভগিনী সুশীলা আর দ্বিধা করলেন না, তোরঙ্গের তালা ভাঙলেন এবং যা পেলেন আত্মসাৎ করলেন। হয়তো দাদার বিষয়সম্পত্তি সবই তিনি শেষ পর্যন্ত পাবেন, কিন্তু আইনের কথা কিছু বলা যায় না। হাতে যা পাওয়া গেছে তা হজম করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই হচ্ছে ভগিনী সুশীলার মনস্তত্ত্ব। প্রাণকেষ্ট পাল কিন্তু পুরুষমানুষ, হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান আছে, তাই তোমাকে দেখে তিনি বেজায় নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।—

তারপর আর কি ? এবার বেদব্যাসের বিশ্রাম। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশু মল্লিকের মত আরও কত মহাজন নীরবে তপস্যা করছেন কে তার খবর রাখে !'

ব্যোমকেশ প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া পাশ ফিরিল ; বলিল, 'জাগি পোহাল বিভাবরী। এইবেলা একটুকু ঘুমিয়ে নাও, আজ রাত্রেই কলকাতা ফিরব। হে হে।'